Contents

টাইম
ম্যানেজমেন্ট

টাইম ম্যানেজমেন্ট

ইসমাইল কামদার

ইসমাইল কামদার

টাইম ম্যানেজমেন্ট

আবু মুআবিয়া ইসমাইল কামদার

অনুবাদ
মুহাম্মাদ ইফাত মান্নান

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

টাইম ম্যানেজমেন্ট

আবু মুআবিয়া ইসমাইল কামদার

প্রথম বাংলা-সংস্করণ
জুমাদা-আল-উলা ১৪৪১ হিজরি। জানুয়ারি ২০২০
তৃতীয় মুদ্রণ
রবি-আস-সানি ১৪৪২ হিজরি। ডিসেম্বর ২০২০
ISBN: 978-984-8046-43-2
www.seanpublication.com

MRP: ৳ ২১৮ । 10 $

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+88 01781 183 501

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব-আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থরচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্যকেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না।
>
> [সহীহ জামি'উস-সাগীর, হাদিস নং ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অবৈধ উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ বলেন,

« ...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। »

[কুরআন, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন,

« ...তোমরা সীমালঙ্ঘন কোরো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।»

[কুরআন, ৫:৮৭]

সূচি

সম্পাদকের কথা

ফজরের সালাতের পর রাসূল ﷺ সাহাবিদের খোঁজখবর নিতেন। কেউ কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে তার ব্যাখ্যা করতেন। বিভিন্ন সময় উৎসাহমূলক বিভিন্ন কথাবার্তা বলতেন।

একদিন ফজরের পর তিনি উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্য আজ কে সাওমের নিয়্যাত করে ঘুম থেকে উঠেছ?"

আবু বাক্‌র আস সিদ্দীক ﵁ বললেন, "আমি।"

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মাঝে কে আজ জানাযায় অংশ নিয়েছ?"

আবু বাক্‌র ﵁ বললেন, "আমি।"

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে খাইয়েছ?"

আবু বাক্‌র ﵁ বললেন, "আমি।"

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আজ অসুস্থ কাউকে দেখতে গিয়েছ?"

আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক ﵁ বললেন, "আমি।"

নবি ﷺ বলেন, "এই কাজগুলো যদি কেউ একই দিনে করে তবে আশা করা যায়, তাকে জান্নাত দেওয়া হবে"।

এরাই ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু আমরা তাদের উত্তরসূরি হয়ে টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পশ্চিমাদের বই খুঁজি।

আমরা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে করা এক যুদ্ধ বিক্রি করে এখনও খাওয়ার ধান্ধা করি। অথচ একেকজন সাহাবি এক জীবনে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ কিংবা তারও বেশি। আমরা এমন আত্মনিবেদিত মানুষের জীবনী পড়ার সময় হয়তো ভাবি, যুদ্ধই হয়তো ছিল তাদের জীবন; ঘরসংসার নিয়ে তাদের ভাবতে হয়নি। কিন্তু না! তারা চিরকুমার ছিলেন না; ছিলেন না কাস্তেবিপ্লবীদের মতো—যারা বিপ্লব বেচে পরনারী ভোগ করে। তাদের প্রায় সকলেরই একাধিক স্ত্রী ছিল এবং সে

স্ত্রীরা তাদের স্বামীর প্রতি সন্তুষ্টও ছিলেন। তারা একটি দুটি নয়, অনেক সন্তান নিয়েছেন এবং তাদের লালন-পালন করেছেন। সবই সামলেছেন তারা।

যখন একটি হাদিস সংগ্রহ করতে মাইলের পর মাইল সফর করতে হতো—এরোপ্লেনে নয়, ঘোড়া-গাধা-উটে চড়ে, তখন ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে কম-বেশ ত্রিশ হাজার হাদিস সংগ্রহ করেছেন। ইমাম বুখারি সাত হাজার পাঁচ শ হাদিস সংকলন করেছেন শুধু সহিহ বুখারিতেই। প্রতিটি হাদিস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি দুই রাকা'আত ইস্তিখারা সালাতও আদায় করেছেন।

পাখির পালক কালিতে চুবিয়ে লেখার যুগে অনেক মুসলিম বিদ্বান যে রচনা করে গিয়েছেন, আমাদের অনেকে এক জীবনে হয়তো পড়েও শেষ করতে পারব না।

তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের সব কাজ সহজ করে দিয়েছে। ক্লিকেই দুনিয়ার তথ্য আমাদের নখের ডগায়। আমরা পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রাতরাশ সেরে অন্য প্রান্তে দুপুরের কাইলুলা করতে পারি। এত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেও পূর্বসূরিদের মতো যোগ্য সন্তান জন্ম দিতে এই জাতি আজ ব্যর্থ। সকাল হয়, দিন গড়িয়ে রাত হয়, আবার সূর্য ওঠে। আলু-পেঁয়াজ আর বিদ্যুৎ-বিলের হিসাব মেটাতেই বেলা শেষ। পৃথিবীকে দিয়ে যাওয়ার মতো কিছুই করা হয় না। সময় নেই, ব্যস্ত।

আমরা কি আসলেই ব্যস্ত—নাকি ব্যস্ততার অভিনয় করি, কিছু না করেই নিজেকে কিছু একটা প্রমাণ করার কসরতে। একটু বসুন নিজের সাথে। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন।

তথ্যপ্রযুক্তির অক্টোপাসে জড়ানো আধুনিক এই সময়ে জীবনটাকে আরেকটু যারা অর্থবহ করতে চান; পৃথিবীতে রেখে যাওয়ার মতো কিছু করতে চান তাদের জন্য সিয়ানের এই বই 'Time Management'।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বইটি অনুবাদ করার পক্ষে ছিলাম না। কারণ, লেখক এত সহজ সরল ইংরেজিতে রচনাটি করেছেন যে, যারা মোটামুটি ইংরেজি পড়তে পারেন তারাই বুঝতে পারবেন। কিন্তু পাঠকদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমার অবস্থান থেকে সরে এসে অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

বইটি লিখেছেন ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটির হেড টিউটরিয়াল এসিস্ট্যান্ট উস্তাদ ইসমা'ঈল কামদার। বইটির বাংলা অনুবাদ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে সিয়ান পরিবার আনন্দিত। আল্লাহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
প্রধান সম্পাদক
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
সেপ্টেম্বর, ২০১৯

পূর্বকথা

আর-রাহমান, আর-রাহীম আল্লাহর নামে।

টাইম ম্যানেজমেন্ট বা সময় ব্যবস্থাপনার ওপর বই লেখার ধারণা আমার মাথায় প্রথম আসে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সাথে সাথে আমি লেখাও শুরু করে দিই, কারণ আমার একদমই তর সইছিল না, ভীষণ রকমের উদ্দীপনা কাজ করছিল তখন। আর সবাই যাতে দ্রুত আমার লেখাটা পড়তে পারে এ নিয়ে এতই উদগ্রীব ছিলাম যে, তাড়াহুড়োয় একটা আনাড়ি ভুল করে বসি।

আমি কাউকে দিয়ে প্রুফরিড করানো কিংবা কোনো দক্ষ সম্পাদনা ছাড়াই বইটি নিজে নিজে ছাপিয়ে ফেলি। শেষমেশ ২০১৫ সালের মার্চ মাসে বইটা বের হয়, অনেকেই বইটি পড়ে উপকৃত হয় ঠিকই কিন্তু বইটি ছিল অনেকগুলো মুদ্রণজনিত ভুলে ভরা। একজন পারফেকশনিস্ট হিসেবে এটা আমার জন্য বেশ লজ্জাজনক। যাহোক, আমি আমার ভুল থেকে শিখেছি। এরপর থেকে যত বই-ই আমি লিখব, বাজারে বের করার আগে সবগুলোর সম্পাদনা করানো হবে।

ছাপানোর দিকটা বাদ দিলে আমার বইটা নিয়ে আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম না। বইটায় অসংখ্য পরীক্ষিত কৌশল আর নিয়ম বলা আছে, যা আমার মতে বেশ উপকারী। কেউ সেগুলো ঠিকমতো কাজে লাগালে সেগুলো তার জীবনই পালটে দিতে পারে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যথাশীঘ্র বইটার দ্বিতীয় সংস্করণ বের করব।

সঙ্গে সঙ্গে চিরুনি অভিযানে নেমে গেলাম। বইয়ের ভুলগুলো খুঁজতে লাগলাম এবং সম্পাদনার জন্য পাঠানোর আগেই অনেকগুলো ভুল নিজেই সংশোধন করে ফেলেছিলাম। এ কাজ করতে করতে আমার মনে হলো বইটার কলেবর আরও বাড়ানো যেতে পারে। যে যে দিকগুলোকে আরও উপকারী করা যেতে পারে, সেগুলো নোট করতে লাগলাম। এভাবে শেষমেশ বইটা আরও ৫০ পৃষ্ঠা বেড়ে গেল।

বইয়ের অতিরিক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে কিছু খসড়া তালিকা যুক্ত করেছি। বইয়ে যেসব কৌশল আলোচনা করেছি সেগুলোর আলোকেই এ টেমপ্লেটগুলো সাজানো। বইটির

প্রথম প্রকাশের পর টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আরও যা লিখেছি সেগুলো পরিশিষ্টতে থাকছে। এছাড়াও প্রতিটি অধ্যায়ে যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেখানে উদাহরণ এবং অতিরিক্ত ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি।

আমি ভালো করেই জানি মানুষের লেখনী কখনোই একেবারে ত্রুটিহীন, যথার্থ নয়। উন্নতির কিছু না কিছু জায়গা থেকেই যায়। কিন্তু এ দ্বিতীয় সংস্করণটা প্রথমটার চাইতে বহুগুণে ভালো। এ সংস্করণে অনেক বিস্তারিত উপকরণ আছে, এছাড়া ব্যাবহারিক কৌশলসহ বহু উপকারী টিপসও আছে।

টাইম ম্যানেজমেন্ট এমন একটা বিষয়, যেখানে আপনি ক্রমাগত উন্নতি করতে পারবেন, নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করবেন। তাই পরবর্তী সংস্করণগুলোতে কিছু না কিছু সংযুক্ত করার সুযোগ থাকে। আমি তাকিয়ে আছি সময় গড়িয়ে যাবার সাথে সাথে টাইম ম্যানেজমেন্টের আরও কৌশল শেখার আশায়, এবং সেগুলো বই আর প্রবন্ধ আকারে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।

আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি এ সংস্করণটা পূর্বেরটার তুলনায় আরও বেশি উপভোগ করবেন। টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং সেল্ফ-হেল্প নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আরও জানতে আমার ওয়েবসাইট http :// islamicselfhelp.com এ ঘুরে আসতে পারেন স্বচ্ছন্দে।

সালাম

আবু মুআবিয়া ইসমাইল কামদার

অনুবাদকের কথা

'Time Management' যখন প্রথম বাজারে আসে তখন বইটি কেনার ব্যাপারে আমি তেমন আগ্রহ দেখাইনি। একটু ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল বটে কিন্তু জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কিছু মনে হয়নি। সেটার কারণ সম্ভবত তখনও সময়কে 'ম্যানেজ' করার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করিনি। তখন ছিল হাতে অফুরন্ত সময় আর পড়াশোনা ছাড়া তেমন কোনো কাজে সে অফুরন্ত সময় কাজে লাগানোর তাগিদ ছিল না। তবুও কিনেছিলাম, কারণ সিয়ানের বই। এরপর যখন বইটি পড়া শুরু করি তখন ইউনিভার্সিটিতে। আর সে সময় হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিলাম আধুনিক যুগে সময়ের বারাকাহ কত কমে গেছে আর একজন মুসলিমকে সে বারাকাহ ফিরিয়ে আনতে প্রতিনিয়ত কতটা সংগ্রাম করতে হয়। ইবাদাত, পড়াশোনা, চাকরি, বিনোদন, ব্যক্তিগত জীবন—সবকিছু ইফেক্টিভলি ম্যানেজ করতে পারাটা এ যুগে অনেক বড় একটা স্কিল। সে স্কিল আয়ত্ত করা আবার এতটা সহজও না। আমাদের এমন অনেক বন্ধু আছে, যারা লাস্ট মোমেন্টে এসে সবকিছু করেও কীভাবে কীভাবে যেন সফলতা পেয়ে যায়। তাদের দেখে আমাদের এই ভ্রান্তি ঘটে যে, টাইম ম্যানেজমেন্টের কী দরকার! এসব ম্যানেজমেন্ট মানেই নিয়ম-কানুন আর মোটিভেশন। কিন্তু একজন মুসলিমের জীবনে নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো একেকজনের জীবনে নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলার মাত্রা বিভিন্ন কিন্তু এটা থাকতেই হবে, আপাতত যতই বোরিং মনে হোক না কেন।

শায়খ ইসমাইল কামদার এ নিয়ম-কানুনকেই এত সহজ করে দেখিয়েছেন যে, অনুবাদ করতে গিয়ে আমার মনে হয়নি যে আমি গতানুগতিক কিছু অনুবাদ করছি। 2 minutes rule, S.M.A.R.T goal, to-do-list-এর মতো টেকনিকের কথা আগেও আমরা পড়েছি কিন্তু সময়ের বারাকাহ কীভাবে পাওয়া যায় এটা নিয়ে হয়তো আগে তেমন কেউ পড়েননি। যারা জানেন এবং বোঝেন যে, সময়কে স্মার্টলি ব্যবহার করতে পারলে জীবন সহজ হয়ে যায় তাদের জন্য এ বইটা মাস্ট রিড।

এটা আমার প্রথম অনুবাদ। এর আগে খণ্ড খণ্ড কাজ করেছি তবে পুরো বই এই প্রথম। চেষ্টা করেছি লেখা সহজ-সাবলীল রাখতে, কারণ সেল্ফ-হেল্পের অনেক টপিকই বাংলায় অপরিচিত। ধন্যবাদ মাসুদ শরীফ ভাইকে, উনিই কাজটি দিয়েছিলেন আর সময়ে সময়ে দ্রুত অনুবাদ শেষ করার তাগাদা দিয়ে আমার নিজের টাইম ম্যানেজমেন্টের ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছিলেন।

আশা করি উপভোগ করবেন।

দু'আ প্রার্থী।
মুহাম্মাদ ইফাত মান্নান

বইটি যেভাবে পড়া যেতে পারে

সেল্ফ-হেল্প বা আত্ম-সহায়তামূলক বইগুলো তাদের ব্যাবহারিক উপযোগিতার জন্য স্বতন্ত্র। একটি ভালো সেল্ফ-হেল্প বই সেটাই, যেটাকে পাঠক সম্পদের মতো গুরুত্ব দেন। তিনি সেটা বারবার পড়েন, বারবার খুলে দেখেন। আশা করি এ বইটি তেমনই হবে।

সেল্ফ-হেল্প বই অনেকভাবে পড়া যায়। এ বইটি পড়ার কিছু পদ্ধতি আমি নিচে উল্লেখ করছি—

দ্রুত পঠন

আপনি পুরো বইটি খুব দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে যেতে পারেন। এভাবে প্রতিটা অধ্যায় সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়ে যাবেন, কোন অধ্যায়ে কী আছে, কোনটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক—এসবের ব্যাপারে পরিচিতি লাভ করবেন। একই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করার ব্যাপারেও অনুপ্রেরণা পাবেন। এ পদ্ধতিটা মূলত তাদের জন্য, যারা বইয়ের মূল বক্তব্যটা সংক্ষেপে জানতে চান কিন্তু বিস্তারিত পড়ার সময় নেই।

বিস্তারিত অধ্যয়ন

বিস্তারিত অধ্যয়ন বলতে বোঝানো হচ্ছে—বইয়ের প্রতিটা বাক্যকে অনুধাবন করে পড়া, আয়ত্ত করা, ভালোভাবে বোঝা এবং কীভাবে নিজের জীবনে কাজে লাগাতে হবে—সেটা জেনে নেওয়া। এভাবে পড়াটা অনেক ধীরগতির বটে কিন্তু এতে পরিবর্তন আসবে দ্রুত।

নোট নেওয়াটা বিস্তারিত অধ্যয়নের একটি অংশ। এ নোট নেওয়া অনেক রকমের হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো দাগিয়ে রাখা অথবা প্রাসঙ্গিক কোনো বক্তব্যের সারাংশ টাইপ করা অথবা লিখে রাখা। আবার এর অর্থ হতে পারে—এ বইয়ের 'যা

যা করব' বিভাগটা ভালোভাবে পড়া এবং সেখানে উল্লিখিত প্রতিটা কাজ ঠিকমতো করা। এ পদ্ধতিতে—যা পড়েছেন তা দীর্ঘ সময় ধরে মনে থাকে, গভীর অনুধাবন তৈরি হয় এবং যা পড়েছেন, তা প্রয়োগ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কর্ম পরিকল্পনা

এ বইটি পড়ার তৃতীয় পদ্ধতি হলো—প্রতি অধ্যায়ের শেষে যুক্ত 'যা যা করব' অংশটা মনযোগ দিয়ে পড়া এবং সেগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা। এ অংশটা মূলত প্রতিটি অধ্যায়ের মূল কথাগুলোর সারাংশ; পাশাপাশি কীভাবে বাস্তবে কাজে লাগাতে হবে, সে ব্যাপারে ব্যাবহারিক উপদেশ সংবলিত।

পড়ার এ পদ্ধতিটা বাস্তবায়নের দিকে বেশি নজর দেয়। যদি আপনি বিস্তারিত জানতে না চান এবং শুধু মূল বিষয়গুলোই জেনে নিয়ে প্রয়োগ করার ব্যাপারে আগ্রহী হন, তা হলে আপনার কাজ হবে 'যা যা করব' অংশটা দিয়ে শুরু করা। এ ছাড়া বইয়ের শেষের দিকে টাইম ম্যানেজমেন্ট টিপস অধ্যায়টা আপনার কাজে লাগতে পারে।

বেছে বেছে পড়া

বইয়ের কিছু অধ্যায় অন্য কারো চেয়ে আপনার জীবনের সাথে বেশি প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি ওই অধ্যায়গুলো আগে পড়তে পারেন তারপর বাকি অধ্যায়গুলো। এমন কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই যে, আপনাকে শুরু থেকেই পড়তে হবে।

যেমন খুশি তেমন পড়া

এটা আপনার বই এবং এটা আপনার নিজের টাকায় কেনা, তাই আপনার যেভাবে ভালো লাগে বইটি সেভাবেই পড়ুন। অন্য কারো কথা শোনার দরকার নেই, এমনকি লেখকের কথাও না। যদি বইটি আপনার ভালো লাগে, এর থেকে উপকৃত হন এবং আপনার বন্ধুদের এ বইটি পড়ার পরামর্শ দেন আর বইয়ের লক্ষ্যগুলো পূরণ করেন তা হলে এ বই সার্থক। কীভাবে লক্ষ্যগুলো পূরণ করেছেন অথবা বইটি কীভাবে পড়েছেন, এতে আমার কিছুই যায় আসে না। আপনি বইটি উপভোগ করেছেন কি না, সেটাই আসল কথা।

সময়ের বারাকাহ নেই?

নিচের কথোপকথনটা দেখুন, চেনা চেনা লাগে?

আহমাদ : শুক্রবার চলে এল। সময়গুলো যে কীভাবে চলে যায়!

আয়িশা : হ্যাঁ, সপ্তাহটা যেন চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল। সময়ের যেন কোনো বারাকাহ নেই।

আহমাদ : কিয়ামাতের লক্ষণ এটা। কোনো কিছুই যেন করা হচ্ছে না ইদানীং। কাজ করতে করতে আর বিল দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আর কিছু করার সময়ই পাই না।

আয়িশা : ঠিক বলেছ। বাচ্চা আর ঘরের কাজ সামলাতে সামলাতেই সময় শেষ হয়ে যায়। একটি বই পড়ি না কত মাস হয়ে গেল!

আহমাদ : কী আর করবে? এটাই তো জীবন, তাই না?

আয়িশা : হ্যাঁ, এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে।

ওপরের কথোপকথনের সামান্য অংশও যদি চেনা মনে হয়, তা হলে আপনার জন্য সুখবর। দরকারি বইটিই কিনেছেন। এ বইয়ে আপনি কিছু সুন্দর অভ্যাস ও কৌশল শিখবেন, যেগুলো অনুসরণ করে আপনি সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারবেন।

অনেকেই অভিযোগ করে—সময়ের বারাকাহ চলে গেছে। কিন্তু আমি মনে করি না, সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। বারাকাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার এবং কেউ তাঁর কাছে বারাকাহ চাইলে, পাওয়ার চেষ্টা করে গেলে তিনি তাকে সেটা দেন। তো আপনি যদি আল্লাহর কাছে সময়ের বারাকাহ চেয়ে দু'আ না করে থাকেন, আপনাকেই বলছি, এখনই যান। (হ্যাঁ! বই বন্ধ করুন, আগে দু'আ করে আসুন, শেষ হলে এ পৃষ্ঠা থেকে আবার পড়া শুরু করুন)। যদি আপনি বারাকার জন্য দু'আ করেও

কোনো পরিবর্তন দেখতে না পান, তা হলে আপনার জীবনযাপনে পরিবর্তন দরকার। হতে পারে আপনার কিছু অভ্যাস বদলাতে হবে এবং এভাবে বারাকাহ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে। এ বইটি সে কাজেই আপনাকে সহযোগিতা করবে।

সামনের অধ্যায়গুলোতে আমরা কিছু অভ্যাস এবং কৌশলের ব্যাপারে জানব, যা পরীক্ষিত এবং শতভাগ হালাল! (আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয়দিক থেকে)। সময় গোছাতে এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণে এগুলো আপনার সহায়ক হবে।

শুরু করার আগে একটি গল্প বলি। কীভাবে আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট আবিষ্কার করি এবং কীভাবে এ আবিষ্কার আমার জীবন গোছাতে সাহায্য করেছিল, সেই গল্প।

'৯০ ও '০০-এর দশকে বেড়ে ওঠা আমার প্রজন্মটা ছিল 'সময় নষ্টের' কাজে উসতাদ। ভিডিও গেমস, মুভি ছিল সময় নষ্টের অন্যতম উপকরণ। এভাবে সময় অপচয় করে দিন শেষে আমরাই আবার আফসোস করতাম, বড় কোনো কাজ করার মতো সময়ই পাই না। আর আমিও যেহেতু এ প্রজন্মেরই একজন, এমন কিছু বদঅভ্যাস আমারও ছিল। যেগুলো আপনাদের মাঝেও কারো কারো থাকতে পারে। যেমন, সময়ের কোনো হিসেব ছাড়াই রাত জেগে ভিডিও গেমস খেলা, মজার কোনো কাজ করতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দেওয়া এবং সবচেয়ে বাজে মাল্টি-টাস্কিং করা।

২০১০ সালে সহকারী শিক্ষক হিসেবে আমি ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিই। যোগ দেবার সাথে সাথেই কাজের প্রচণ্ড চাপে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমাকে সপ্তাহে ছয়টা ক্লাস নিতে হতো, ই-মেইল আর ফোরাম পোস্টের উত্তর দিতে হতো, আর এসাইনমেন্ট গ্রেডিং-এর কাজও ছিল। আমার মনে পড়ে, সে বছর হাজ্জের সময় আজিজিয়াতে আমি আমার শিক্ষক ড. বিলাল ফিলিপ্সের সাথে আলাপ করি। সেখানে তাকে আমার কাজের প্রচণ্ড চাপের ব্যাপারে অনুযোগ করি। তিনি তখন বললেন, আমি যেন একটি উপায় বের করে নিই। কারণ, কাজের চাপ বাড়বে বই কমবে না। হোটেলে ফেরার সময় তার কথাটি ভেবে দেখলাম। হাজ্জ থেকে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নিলাম, সময়কে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানোর পদ্ধতি নিয়ে কিছু পড়াশোনা করব। তখন থেকে বিগত পাঁচ বছর ধরে আমি সেল্ফ-হেল্প এবং টাইম-ম্যানেজমেন্টের ওপর অনেকগুলো বই পড়েছি। প্রতিটা বই থেকেই আমি অনেক নতুন নতুন কৌশল এবং অভ্যাস সম্পর্কে জেনেছি, যেগুলো আমার দারুণ কাজে এসেছে।

আল-হামদু লিল্লাহ, এখন আমি IOU-এর প্রধান সহকারী শিক্ষক। এখন সপ্তাহে আমি ১২ ঘণ্টা ক্লাস নিই, প্রতি সেমিস্টারে ১০০০-এরও ওপর এসাইনমেন্ট গ্রেড করি। এ ছাড়া আমার ছেলে-মেয়েদের বাসায় পড়াই, বই আর প্রবন্ধ লিখি, অন্য প্রতিষ্ঠানেও পড়ানো হয় এবং সারা সপ্তাহ জুড়ে আরও অনেক কাজ করি। আমি বিশ্বাস করি এটা আসলে দুটো কাজের ফলাফল—

- বারাকার জন্য দু'আ করা।
- প্রতিনিয়ত সময়ের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
- তো, আমি বইটি লেখার ব্যাপারে ধারণা পাই ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বিষয়ের ওপর কিছু লেখা ছিল আমার বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। আমি ইতোমধ্যে অবশ্য টাইম ম্যানেজমেন্টের ওপর অনেক প্রবন্ধ লিখেছি, ওয়েবিনারে বক্তব্য রেখেছি আর ফেসবুকে অল্পস্বল্প কিছু টিপস পোস্ট করেছি।

যাহোক, আমার মনে হতো এ বিষয়ের ওপর লেখনীগুলোতে বড় ধরনের কিছু ফাঁক ছিল। বেশির ভাগ বই সেক্যুলার দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা (তারপরও অবশ্যপাঠ্য)। আর ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বইগুলো হয় এতই যে, মূল বিষয়ের প্রতি মোটেও সুবিচার করা হয়নি; আর নয়তো এতই বিস্তারিত যে, সাধারণ মানুষ সেটা পড়ার আগ্রহই পাবে না। তাই টাইম ম্যানেজমেন্টের ওপর এ বইটি লেখা আমার লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেছিলাম। সেই সঙ্গে দু'আ করছি সেল্ফ-হেল্প সিরিজের বইগুলোর জন্য এ বইটি যাতে একটি ভালো ভূমিকা হয়।

এ বইটি আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য উপহার। আমার সারা দিনের পুরো সময়টার সর্বোচ্চটুকু কাজে লাগানোর জন্য যে কৌশল, অভ্যাস এবং টিপসগুলো অনুসরণ করি, সেগুলো এখানে আমি আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করব, যাতে করে আপনারাও আপনাদের সময়কে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এভাবে একদিন, আমাদের প্রিয় পৃথিবীতে আমাদের বসবাস আরো উপভোগ্য হয়ে উঠবে, আরও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

সময়কে ভালোভাবে কাজে লাগানোর মৌলিক যেসব ধারণা, অভ্যাস এবং কৌশল রয়েছে, সেগুলো আমরা সামনের অধ্যায়গুলোতে দেখব। প্রতিটা অধ্যায়ের শেষে থাকবে 'যা যা করব' বিভাগ। এটা মূলত প্রায়োগিক দিকগুলো নিয়ে গঠিত। আমার পরামর্শ থাকবে এ বিভাগে উল্লিখিত কাজগুলো যেন ঠিকভাবে করা হয়,

নিজের জীবনে কাজে লাগানো হয়। এতে করে নিজ নিজ জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আপনারা নিজেরাই অনুভব করবেন।

এ বইটি প্র্যাক্টিক্যাল। শুধুই পড়ে গেলেন, 'খুব ভালো বই' বলে প্রশংসা করলেন, শেষমেশ বুকশেলফে ফেলে রাখলেন, এমনটা করা যাবে না। বরং আপনার উচিত হবে, এখানে বর্ণিত কৌশলগুলো চেষ্টা করে দেখবেন এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করবেন।

আল্লাহ যেন আমাকে এ সিরিজের বইগুলো শেষ করার তাওফিক দেন, আমার কাজ কবুল করে নেন এবং এ বইটিকে পাঠকের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন।

আমীন।

যা যা করব

বইটি পড়ে শেষ করুন :)

সময়ের ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা : ইসলামি দৃষ্টিকোণ

'রিয্ক' নিয়ে আমাদের অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। এ অধ্যায়টা বোঝার আগে রিয্ক নিয়ে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আল্লাহ্ আমাদের যা যা দিয়েছেন, সে সবকিছুই রিয্ক। এটার ভালো বাংলা হতে পারে—সম্পদ। অনেকে রিয্ক বলতে শুধুই জাগতিক ধন-সম্পদ বোঝেন। আসলে ধন-সম্পদ, সুস্বাস্থ্য, যৌবন, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, নিরাপত্তা, জ্ঞান এবং সব ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাই রিয্ক হতে পারে। এ ছাড়া এ বইয়ের মূল আলোচ্য—সময়ও রিয্কের মধ্যে পড়ে।

সময় যে রিয্কের একটি অংশ, এটা আমাদের বুঝতে এবং মেনে নিতে হবে। তা হলেই টাইম ম্যানেজমেন্টের সত্যিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। সুস্বাস্থ্য এবং ধন-সম্পদের মতো সময়ও রিয্কের অংশ। কিন্তু অন্যান্য রিয্কের তুলনায় সময়ের দুটো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

- এক দিনে প্রতিটা মানুষের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরিমাণ একই।
- সময় নবায়নযোগ্য নয়, অর্থাৎ সময় একবার চলে গেলে আবার পাওয়া যায় না।

> " সময় হলো তরবারির মতো; তুমি যদি তাকে ব্যবহার না করো, সে-ই তোমাকে ব্যবহার করবে।" (ইমাম আশ শাফিঈ রহ.)

পৃথিবীতে একজন মানুষের জন্য কতটুকু সময় বরাদ্দ, এটা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আর এই দিক বিচারে তাই সময় অন্যান্য রিয্কের মতোই। পৃথিবীতে কেউ খুব অল্প সময়ই বাঁচে কিন্তু এর মাঝেই সে অনেক কিছু করে যায়। কারণ সে সময়কে মূল্য দিয়েছে। কেউ আবার

অনেকদিন বাঁচার পরও তেমন কিছু করে যেতে পারে না। কারণ, সে সময়ের মূল্য অনুধাবন করতে পারেনি।

ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো সময়ের ব্যাপারে আমাদের ধারণাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। আর নিচের তিনটা পয়েন্ট আমাদের কাছে সময়ের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করে তুলবে।

- নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়কে কোনোভাবেই বাড়ানো সম্ভব না। তবে অন্যদের চেয়ে সময়কে আরও ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকা সম্ভব।

- যেহেতু সময় ফিরে পাওয়া যায় না, কাজেই সময় অপচয় করাটা বোকামি। কেন এমন সম্পদ আপনি অপচয় করবেন, যা কিনা ফিরে পাওয়া যায় না?

- আমরা কেউই জানি না আমরা কতদিন বেঁচে থাকব। তাই বর্তমান সময়টা নষ্ট করার মতো বিলাসিতা কি আমাদের করা উচিত? কোনোভাবেই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়।

এগুলো মাথায় রাখলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সময় কত গুরুত্বপূর্ণ এক সম্পদ। আরও বুঝতে পারি, সময় নষ্ট করা টাকা নষ্ট করার চেয়েও খারাপ! কারণ, টাকা আবারও ফিরে আসতে পারে কিন্তু সময় কখনোই ফিরবে না।

সময় নিয়ে যত হাদিস আছে, সেগুলোকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হাদিসগুলোর অর্থ আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। নিচের হাদিসটিকে ওপরের কথাগুলোর আলোকে বিবেচনা করা যাক,

> "পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিস থেকে উপকৃত হয়ে নাও। বার্ধক্যের আগে তারুণ্য, অসুস্থতার আগে সুস্থতা, দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতা, ব্যস্ততার আগে অবসর এবং মৃত্যুর আগে জীবন।" (শু'আবুল ঈমান ৯৫৭৫; সহহ আল জামে ১০৭৭)

লেখকের মন্তব্য :

- হাদিসটিতে যেসব জিনিসের কথা বলা হয়েছে সবই এক প্রকার রিয্ক। যেমন, তারুণ্য, সুস্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, অবসর এবং আমাদের জীবন।

- তাই এসব আমরা কীভাবে কাজে লাগাচ্ছি, এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

- লক্ষ করলে দেখবেন, হাদিসটিতে অবসর সময়ের কথা বলা হয়েছে, পুরো চব্বিশ ঘণ্টার কথা বলা হয়নি। আমাদের প্রতিদিন অনেক পার্থিব প্রয়োজনীয়

কাজ করতে হয়। যেমন, সালাত, চাকরি ইত্যাদি। এ সময়গুলোতে অন্য কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই আসলে গোটা চব্বিশ ঘণ্টা নয় বরং অবসর সময়কে আমরা কীভাবে কাজে লাগাচ্ছি সেটাই বিবেচ্য।

> "দুটি এমন নিয়ামাত আছে, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন। এগুলো হলো, সুস্থতা এবং অবসর।" (সহীহ আল বুখারী)

লেখকের মন্তব্য :

- হাদিসটিতে দুটি বিষয়কে সামনে আনা হয়েছে—সুস্থতা এবং অবসর।
- এ দুটি বিষয়ই ভালো কাজ করার জন্য খুব দরকার। সুস্বাস্থ্য এবং পর্যাপ্ত সময় ছাড়া ভালো কাজ করাটা খুব কঠিন।
- উভয় বিষয়কেই আমরা যেন আমাদের প্রাপ্য জিনিস বলে ধরে নিই। দাঁত থাকতে যেন দাঁতের মর্যাদা বুঝি।
- এ নিয়ামাতগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। আর এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এ নিয়ামাতগুলো ভালো কাজে ব্যবহার করা। তাই অবসরকে কাজে লাগাতে হবে, কিছুতেই সময় নষ্ট করা যাবে না।

> "আল্লাহ বলেছেন, আদাম সন্তান সময়কে গাল-মন্দ করে আমাকেই ছোট করে। আমিই সময়, আমার হাতেই সবকিছু এবং আমিই দিন-রাতের আবর্তন ঘটাই।"

লেখকের মন্তব্য :

- এই হাদিসুল-কুদসিতে আল্লাহ বলছেন, তিনিই সময়। 'আলিমগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সময় আল্লাহর অধীনে এবং আমাদের প্রাপ্ত সময়টুকু তাঁরই দেওয়া। তাই এটি এক ধরনের নিয়ামাত। এজন্য সময়কে গাল-মন্দ করাটা আল্লাহকে গাল-মন্দ করার মতোই।
- একটি দিনে আমরা সবাই একই পরিমাণ সময় পাই। কেউ কম বা বেশি না। কাজেই জীবনের অপ্রাপ্তিগুলোর জন্য সময়কে গাল-মন্দ করা নিরর্থক। বরং সময়কে আমরা কীভাবে ব্যয় করছি, সেটা নিয়ে ভাবা উচিত। কীভাবে অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্নভাবে সময়কে কাজে লাগানো যায়, সে চিন্তা করা উচিত।

একজন বিশ্বাসী সময়ের গুরুত্ব বোঝে। সে এটা অপচয় করতে চায় না। ওপরের সবগুলো হাদিস থেকে এটাই বোঝা যায়। সময় এমন একটি সম্পদ, যেটা প্রতি সেকেন্ডে ক্ষয়ে যাচ্ছে। তাই এক ঘণ্টা অপচয় করা মানে সে ঘণ্টাটা আর ফিরে না পাওয়া।

এভাবে সময়ের হিসাব রেখে চলা আর সাধ্যমতো এর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। আমরা সীমিত সময়ের জন্য এ পৃথিবীতে এসেছি। এর মাঝেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং আমাদের নিজেদের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এসব দায়িত্ব পালনে ভারসাম্য কেবল যথাযথ টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমেই সম্ভব।

> আমার সবচেয়ে বেশি আফসোস সেই দিনটির জন্য, যে-দিন সূর্যাস্ত গেল কিন্তু আমার সৎকাজের পাল্লা একটুও ভারি হলো না।
>
> (ইব্‌ন মাসঊদ রা.)

আর এটাই আমি এ বইয়ে আলোচনা করব। আপনাদের সাহায্য করব সে কৌশল এবং অভ্যাসগুলো অর্জন করতে, যেগুলোর মাধ্যমে সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারবেন। এ কৌশলগুলো কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, শিক্ষাজীবনে, পারিবারিক জীবনে, অবসরে এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারবেন। আর সঠিকভাবে এসব মেনে চললে আমাদের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ভারসাম্য আসবে। আর এ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনই সঠিক জীবনব্যবস্থা।

এখন যেহেতু আমরা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে টাইম ম্যানেজমেন্টের গুরুত্ব বুঝে গেছি, আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। পৃষ্ঠা উল্টান এবং টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রথম ধাপটা পড়া শুরু করে দিন।

প্রথম ধাপ: একটি লক্ষ্য নিয়ে বাঁচা

"তোমরা কি মনে করেছ, আমরা তোমাদের অযথা সৃষ্টি করেছি এবং
তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?" (কুরআন ২৩:১১৫)

লক্ষ্য পূরণে টাইম ম্যানেজমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই টাইম ম্যানেজমেন্টের মূল অনুপ্রেরণা—লক্ষ্য পূরণে শৃঙ্খলা। অথচ এখানেই বেশির ভাগ মানুষ ভুল করে বসে। অধিকাংশ মানুষই কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়াই জীবনযাপন করতে থাকে। এভাবে আমাদের দিনগুলো বিস্বাদ হয়ে পড়ে। ভয়, দুশ্চিন্তা আর বিষাদ নিয়ে আমরা দিন কাটাতে থাকি। আর এর ফলে যে শূন্যতা আমাদের ঘিরে ফেলে তা পূরণ করতে আমরা হন্যে হয়ে পড়ি। একের পর এক বিনোদনের উপকরণ দিয়ে আমরা যেন আমাদের ভেতরের মানুষটার মুখ বন্ধ করে রাখতে চেষ্টা করি। যেন আমাদের চিন্তার বন্ধ্যাত্বকে আমরা দেখতে না পাই, সময়ের অপচয়কে ভুলে যাই।

এসবকিছু মূলত একটি মৌলিক বিষয়ে মুসলিমদের অজ্ঞতার ফলাফল। আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী—এ মৌলিক প্রশ্নটার ব্যাপারে আমাদের উপলব্ধির অভাবেই এসব ঘটছে। এ পৃথিবী পরীক্ষাকেন্দ্র, যেখানে প্রমাণ হয়ে যাবে কে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঠিকভাবে পূরণ করেছে। আল্লাহ বলেছেন,

"আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে কেবল আমার 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই
সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

আমাদের সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর 'ইবাদাত করা, সব মুসলিমই তাত্ত্বিকভাবে এটা মানে। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা সৃষ্টির এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবিকভাবে মেনে চলতে পারছি না।

তাই আল্লাহর 'ইবাদাত করা অর্থ কী এবং এর পদ্ধতি কী, তা আমাদের জানতে হবে। ইসলামি পরিভাষায় 'ইবাদাতের অর্থ আল্লাহর দাসত্ব, অর্থাৎ তাঁর আদেশ-

নিষেধ মেনে চলা। আমাদের কাজ কিন্তু ২৪টা ঘণ্টা আচার-অনুষ্ঠানে মগ্ন থাকা নয়, বরং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

ইসলামের কিছু কিছু শিক্ষা সরাসরি টাইম ম্যানেজমেন্টের সাথে সম্পর্কিত। এবার সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

মানবতার সেবা

আল্লাহর 'ইবাদাত করার অন্যতম একটি উপায় হলো তাঁর সৃষ্টির উপকারে আসা। আমরা অনেকভাবে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে পারি। শিক্ষকতা, কাউন্সেলিং, চিকিৎসা সেবা কিংবা কাউকে খুশি করা, অনুপ্রেরণা দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এজন্যে আমরা সবার আগে অবশ্যই এমন একটি কাজ খুঁজে নেব, যা করতে আমাদের ভালো লাগে। এরপর সে কাজটি করার জন্য সারা দিনের সময়কে গুছিয়ে নেব। এভাবে আমরা একটি লক্ষ্য ঠিক করে নেব। আমাদের জীবন হবে মানবতার সেবার মাধ্যমে আল্লাহর 'ইবাদাত করার একটি সুন্দর উদাহরণ।

ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া

দা'ওয়াহ ইসলামের একেবারে মৌলিক একটি বিষয়। প্রতিটি মুসলিম দা'ওয়ার এ কাজে অংশ নিতে পারে। নিজে একজন ভালো মুসলিম হয়ে, আমাদের কাজগুলোতে ইসলামের ছাপ রেখে আমরা সবার কাছে ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারি। বন্ধুদের, সহকর্মীদের এবং পরিবারের সদস্যদের কাছে ইসলামের মূল কথাগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে দা'ওয়াহ দেওয়া যায়। এভাবে দা'ওয়াহ যখন আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে পড়ে, তখন আমরা সময়কে ঠিকভাবে ব্যবহার করার আরেকটা কারণ হাতে পেয়ে যাই।

ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা

আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের জীবনযাপনও করা সম্ভব হবে না। তাই ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। আর এ জ্ঞান ধীরে ধীরে বাড়ানোর চেষ্টাও করে যেতে হবে। এভাবে আমরা আরেকটা লক্ষ্য পেয়ে গেলাম, যাকে কেন্দ্র করে আমরা টাইম ম্যানেজমেন্ট করব। কারণ, সময়কে ভালোভাবে গুছিয়ে না নিলে ধারাবাহিক ইসলামি জ্ঞানার্জন সম্ভব না।

তাই স্পষ্টতই টাইম ম্যানেজমেন্ট একজন মুসলিমের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইসলামে 'ইবাদাতের সাথে জড়িত কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরেই করতে হয়। যেমন, দিনে পাঁচবার নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করতে হয়। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার সালাত আদায়ের অভ্যাস একজন ব্যক্তির মাঝে টাইম ম্যানেজমেন্টের একটি বোধ তৈরি করে। সাওম আর হাজ্জ দুটিই বছরের নির্দিষ্ট দুটো মাসের জন্য নির্দিষ্ট। এর ফলে বছরের কোন মাসে আমরা আছি, এটা জানাটা সহজ হয়ে যায়। আবার যাকাতও বার্ষিক একটি বিষয়, তথা সময়ের সাথে জড়িত। অতএব, বোঝা যাচ্ছে সময় আমাদের ধর্মে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার, তাই সময়ের সঠিক ব্যবহার করা খুবই দরকারি।

জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করা এবং সে উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করা টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রথম ধাপ।

জীবনের লক্ষ্যগুলো যেমন হওয়া উচিত

এখন আপনার জীবনের উদ্দেশ্য আপনি জানেন। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এরপর আপনাকে কিছু ব্যক্তিগত লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। এ লক্ষ্যগুলো হতে হবে আপনার নিজস্ব প্রতিভা, ভালো লাগা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আপনার জীবনে এ লক্ষ্যগুলো যাতে এমন একটি পথ তৈরি করে নেয়, যা আপনার কাছেও ভালো লাগে এবং আল্লাহকেও সন্তুষ্ট করে।

লক্ষ্য ঠিক করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য যাদের পরিষ্কার তাদের জীবনযাপন হয় গোছানো। তারা আগেভাগে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, সদাপ্রস্তুত ও উদ্‌যমী থাকে, আর প্রতিটি নতুন সকাল তাদের জন্য সম্ভাবনাময়। তারা হাসিখুশি হয় এবং তাদের জীবনে পরিপূর্ণতা অনুভব করে। কারণ, তাদের একটি গন্তব্য আছে। তাদের আত্মবিশ্বাস থাকে প্রবল, কারণ তারা মহৎ কিছুর জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

যে লক্ষ্যই ঠিক করুন না কেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে দক্ষ হতে হবে। কিন্তু এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। যেমন, আপনি যদি ভালো লিখতে পারেন, তা হলে বই কিংবা প্রবন্ধ লেখাকে আপনার লক্ষ্য বানিয়ে নিন। যদি ব্যবসায় আপনার আগ্রহ থাকে, তা হলে এমন কিছু ব্যবসায়িক প্রকল্পের উদ্যোগ নিন, যা মানুষের উপকারে আসবে। যদি বাচ্চা-কাচ্চাদের সঙ্গ উপভোগ করেন, তা হলে শিক্ষকতা করতে পারেন। প্রথমে নিজের প্রতিভাটা খুঁজে বের করুন। এরপর সে প্রতিভা কাজে লাগানোর মতো মহৎ কোনো লক্ষ্য বেছে নিন।

যখন বলার মতো কিছু লক্ষ্য থাকে, জীবনও বদলাতে শুরু করে। সবকিছুই বেশ গোছানো এবং অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সকালে জেগে ওঠার পর হাহাকার জাগে না বরং আশান্বিত হয়ে ওঠার আলোক উদ্ভাসিত হয়। এই ছোট একটি পরিবর্তন বিশাল এক আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়, কারণ তখন জীবনযাপনে একটি গতি জন্মায়।

একটি ভালো লক্ষ্য নৈরাশ্যবাদীদের কাছে অসম্ভব আর আশাবাদীদের কাছে সহজ মনে হয়। ভালো লক্ষ্য দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার ব্যাপার, রাতারাতি অর্জন করে ফেলার মতো কিছু নয়। এর জন্য দরকার অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা করার ক্ষমতা এবং আশাবাদী দৃষ্টি দিয়ে দূর ভবিষ্যতে তাকানোর মতো মানসিকতা। এর ফল পেতে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে জীবনের অসংখ্য বছর, দিন ও মাস। তবু এর জন্য শ্রম দেওয়া অথবা এর পেছনে জীবনভর লেগে থাকাটা অনর্থক হবে না।

লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য অধিকাংশ সেল্ফ-হেল্প বই-ই S.M.A.R.T ফর্মুলা দিয়ে থাকে। এটা সহজ কিন্তু কার্যকরী। লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য বিবেচ্য পাঁচটা মূল বিষয়ের কথা S.M.A.R.T ফর্মুলাতে আছে। তাই এই বইয়েও আমরা একই মডেল ব্যবহার করব।

একটি S.M.A.R.T লক্ষ্য সেটাই, যা:

Specific (সুনির্দিষ্ট):

লক্ষ্যটা অস্পষ্ট হওয়া উচিত না। এটা হতে হবে একেবারে সুনির্দিষ্ট, যাকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া যায়। "আমি একজন লেখক হতে চাই" একটি অস্পষ্ট লক্ষ্য; কিন্তু "আমি ইসলামি পরিপ্রেক্ষিতে আত্মবিশ্বাসের ওপর একটি বই লিখতে চাই"—খুব সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য।

Measurable (পরিমাপযোগ্য):

লক্ষ্যটাকে এমন হতে হবে যাতে এর অগ্রগতির হিসাব রাখতে পারা যায়। লক্ষ্য পূরণের কতটুকু কাছাকাছি বা দূরে আছেন এটা যেন আন্দাজ করা যায়। ব্যাপারটা আসলে অতটা সহজ না। একে তো দীর্ঘস্থায়ী, তার ওপর পরিমাপ করার মতো কোনো একক নেই। তাই গন্তব্যের কাছাকাছি না দূরে আছেন, এটা জানা সহজ না। পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যের একটি উদাহরণ হতে পারে—প্রতিদিন সাড়ে তিন পৃষ্ঠা লিখে মাসে একশ পৃষ্ঠার লক্ষ্যে পৌঁছানো।

Attainable (অর্জনযোগ্য):

এর মানে লক্ষ্যটা যেন নাগালের মধ্যে হয়। আপনি একটি মাল্টি মিলিয়ন ডলারের ইসলামিক সেন্টার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এর জন্য আপনার সঞ্চয়ে কিছুই নেই। তা হলে এ লক্ষ্যটা আর অর্জনযোগ্য থাকল না। এসব লক্ষ্য হয় ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখতে হবে অথবা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে আরও অর্জনযোগ্য বানাতে হবে।

Realistic (বাস্তবসম্মত):

যে লক্ষ্যটা ঠিক করেছেন, সেটা করার সক্ষমতা এবং সদিচ্ছা দুটোই থাকতে হবে। আপনি যেখানে লেখালেখির কাজটিই পছন্দ করেন না, সেখানে ৫০০ পৃষ্ঠার বই লেখার লক্ষ্য নির্ধারণ করাটা অবাস্তব। আপনাকে জানতে হবে আপনি কীসে দক্ষ, কোন কোন জায়গায় আপনি ছাড় দিতে পারবেন। এরপর লক্ষ্যটাকে সেভাবে ঠিক করে নিতে হবে।

Timely (সময়মাফিক):

সবশেষে, লক্ষ্য পূরণের জন্য সময়সীমা থাকতে হবে। কোনো সময়সীমা না থাকলে আপনি কাজ করার জন্য তাড়া অনুভব করবেন না। "কোনো একদিন আমি ৩০০ পৃষ্ঠার একটি বই লিখব" কথাটা আসলে নিরর্থক। আগামী তিন মাসে প্রতিদিন চার পৃষ্ঠা করে একটি বই লিখার লক্ষ্য হলো সময়মাফিক। এভাবে লক্ষ্য ঠিক করলে কাজ করার একটি তাড়া অনুভব করবেন, যেটা এমনিতে হতো না।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি কর্মধারা ঠিক করে দেয়, যা অনুসরণ করে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করা যায়। যেকোনো লক্ষ্য ঠিক করার সময় সেটিকে এ পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের সাথে একেবারে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, যাতে করে শেষমেশ একটি দৃঢ় কর্মপরিকল্পনা গড়ে ওঠে।

একটি S.M.A.R.T লক্ষ্য থাকা মানে আপনার কাছে এমন কিছু একটি আছে, যাকে ঘিরে আপনি আপনার দিনগুলো সাজাতে পারবেন। যেমন আপনার লক্ষ্য যদি হয় একটি বই লেখা, তা হলে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে তিন পৃষ্ঠা লিখতে পারেন আপনি। আর এটাই কার্যকর টাইম ম্যানেজমেন্ট।

কারণ, আপনি জানেন আপনি কী অর্জন করতে চান। এখন আপনার প্রতিদিনকার কাজগুলো আবর্তিত হচ্ছে আরও বড় লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। লক্ষ্যহীন, ভবঘুরে ব্যস্ততা নয়, বরং একটি সাজানো-গোছানো ছোটাছুটি।

জীবনের কেন্দ্রবিন্দু

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয় অর্থ, পরিবার, জীবনসঙ্গী এবং বন্ধুবান্ধব। স্টিফেন কভে তার 'The Seven Habits of Highly Effective People' বইতে এ বিষয়গুলো উল্লেখের পর পরামর্শ দিয়েছেন, অর্থ, পরিবার— এসবের পরিবর্তে আমাদের উচিত আদর্শকেন্দ্রিক হওয়া। আদর্শকেন্দ্রিক জীবনযাপন যতটা গোছানো এবং সুশৃঙ্খল হয়, অন্যসব ক্ষেত্রে ততটা হওয়া সম্ভব না। তবে এ তত্ত্বেও একটি 'কিন্তু' থেকে যায়। এই আদর্শটা কে ঠিক করে দেবে?

নৈতিকতার সুস্পষ্ট ভিত্তি ও মানদণ্ড থাকা উচিত। নাহলে স্রেফ "লোকে বলে" দেখেই একটি অনৈতিক কাজ "নৈতিক" হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। যেমন, "মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন" এ আদর্শের ভিত্তিতে সমকামিতা নৈতিক হলেও বহুবিবাহ অনৈতিক। এক্ষেত্রে ধর্মকে নৈতিকতার ভিত্তি ধরা হলে উল্টোটা ঠিক। এখানেই প্রশ্ন আসে:

কোনটা নৈতিক আর কোনটা অনৈতিক, এটা কে নির্ধারণ করবে?

এ দ্বন্দ্বের একটি সমাধান আছে আমার কাছে। নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করার অধিকার এমন কেউ রাখেন, যিনি মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ-অকল্যাণ বোঝার মতো জ্ঞানী। যার জ্ঞান অন্য মানুষের মতো সীমাবদ্ধ না। আর এমন সত্তা আছেন একজনই। তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ।

আর তাই আমার প্রস্তাব হলো, আমাদের জীবন হতে হবে আল্লাহকেন্দ্রিক। আমাদের জীবন আবর্তিত হতে হবে আল্লাহ এবং তাঁর দেওয়া নিয়ম-কানুনকে ঘিরে। এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে আমরা আসলে একটি আদর্শকেন্দ্রিক জীবনকেই বেছে নিচ্ছি। এ আদর্শ কিন্তু আমাদের কল্পনাপ্রসূত না, বরং ঐশীপ্রেরণা লব্ধ। এ আদর্শ আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থে প্রোথিত আর তাই এর নীতিমালা আমাদের ভালোর জন্যই। একজন মুসলিমের জন্য তাই আল্লাহকেন্দ্রিক জীবনযাপন ব্যতীত সফলতা পাওয়া অসম্ভব।

Contents
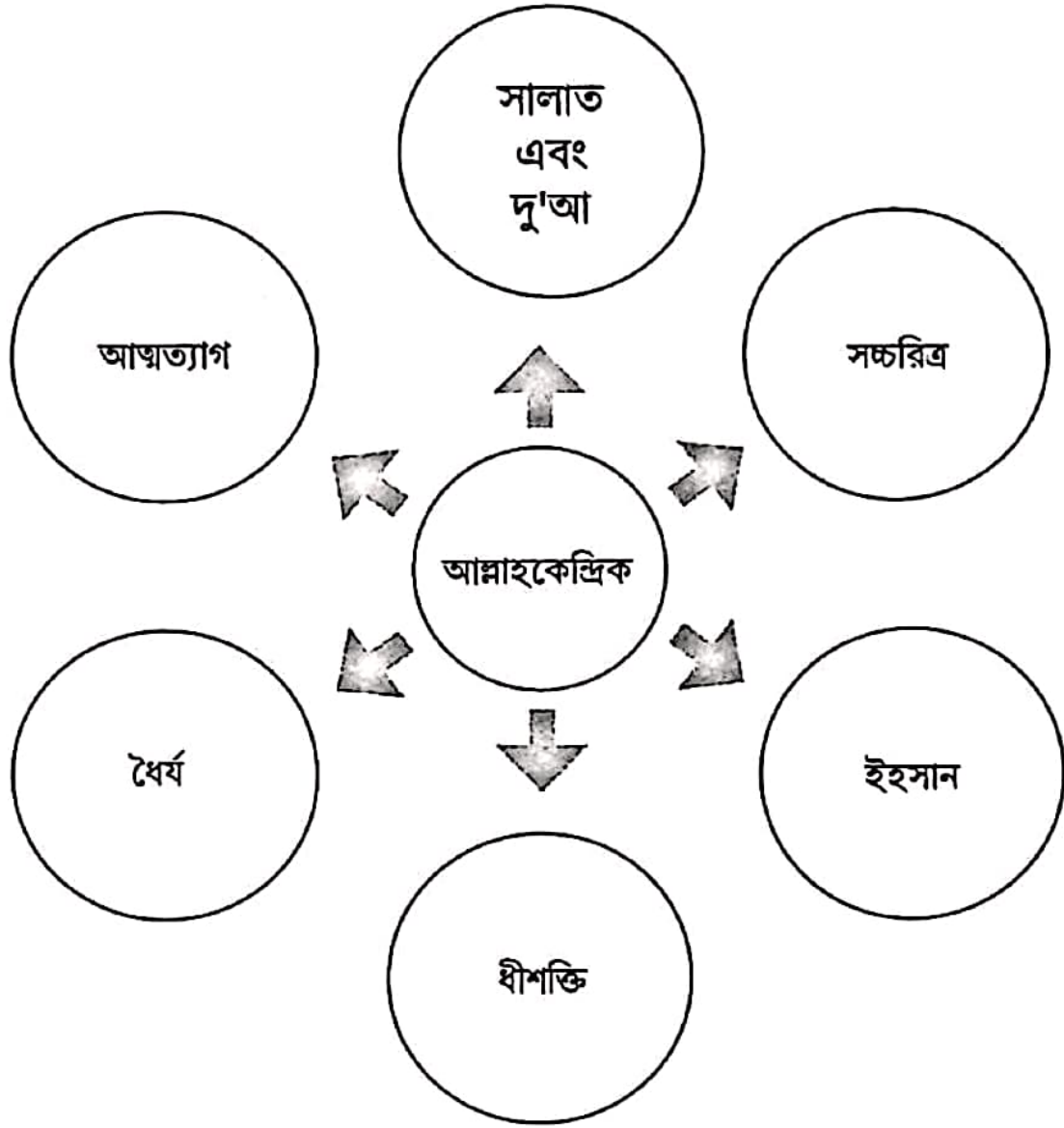
সালাত এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট

আল্লাহকেন্দ্রিক জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সালাতকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া। অনেক মুসলিমই সালাতের সময়কে অন্যান্য কাজের সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। শেষমেশ সালাতটাই আর পড়া হয়ে ওঠে না। আর তারা এর কারণ হিসেবে বলে থাকেন, "সময় পাই না"।

এখানে ভুলটা দু-জায়গায়:

- সময় করে নেওয়ার চেষ্টা না করে সময় পেতে চাওয়া।
- সালাতকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন রুটিন না সাজিয়ে দৈনন্দিন রুটিনের ভেতরে সালাতকে ঢোকানোর চেষ্টা

মুসলিম হিসেবে আমাদের কাছে সবচে বেশি প্রণিধানযোগ্য আমল সালাত। তাই দৈনন্দিন রুটিন সাজানোর সময় আমাদের প্রথম কাজ হবে সালাতের সময়টা আগেভাগে ঠিক করে রাখা, যাতে করে অন্য কোনো কাজ সালাতের মাঝে ঢুকে না পড়ে। ভালো হয় যদি সালাতের সময়টা লাল কালি দিয়ে বড় বড় করে লিখে রাখা যায়। অর্থাৎ, এ সময়গুলোতে আর অন্য কিছু করা যাবে না। যা করার এর আগেই করতে হবে, অন্য কোনো কাজের জন্য এ সময়গুলো সাথে আপস-রফা করা যাবে না।

এভাবে করার অনেকগুলো উপকারী দিক রয়েছে:

- আল্লাহর প্রতি আমাদের দায়িত্ব সবার ওপরে, এ উপলব্ধি অর্জন। এ দায়িত্ব ঠিকভাবে বুঝে নিলে তা আর বাদ পড়ার সম্ভাবনা নেই।
- শৃঙ্খলা এবং সময়ানুবর্তিতা শেখা।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহর সন্তুষ্টি আর তাঁর সাহায্য ছাড়া আমাদের লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব।

সালাত আমাদের জীবনে সবচে বেশি প্রাধান্য পাবে, কিন্তু তাই বলে এটা যেন শুধুই একটি আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয়। সত্যিকার অর্থে সালাত আদায়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে হলে একে যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। পূর্ণ মনোযোগ, একনিষ্ঠতা এবং সালাতের প্রতিটা ধাপ বুঝেশুনে পালন করতে হবে। এভাবে সালাত আদায় করলে তবেই আমরা সালাত আদায়ের মাধ্যমে উপকৃত হব, নয়তো সব কেবলই আনুষ্ঠানিকতা।

সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা বা ইখলাস আবশ্যক। সালাত আদায়ের পেছনের একমাত্র কারণ হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কোনো মানুষকে খুশি করা কিংবা কোনো রকমে পার পাওয়ার জন্য সালাত আদায় করা উচিত নয়। বরং সৃষ্টিকর্তার কাছাকাছি আসার একটি মাধ্যম হতে হবে আমাদের সালাত।

সালাত থেকে উপকার পেতে হলে একনিষ্ঠতার পর দ্বিতীয় শর্ত হলো বুঝেশুনে সালাত আদায় করা। সালাতে আমরা কী পড়ছি, সেটা বোঝার সবচে উত্তম উপায় হলো আরবি ভাষা শেখা। অবশ্য অনেকের জন্য সেটা কঠিন এবং খুব কম মানুষই এটা পারে। তবে ভাষা শেখা সম্ভব না হলেও অন্তত সালাতে যা পড়ছি, তার অনুবাদ ও খানিকটা ব্যাখ্যা জেনে রাখা যায়।

বুঝেশুনে পড়ার পাশাপাশি সালাতে মনোযোগও থাকতে হবে। স্থিরতা, মনোযোগ এবং আত্মিক প্রশান্তি অর্জনের পেছনে সালাত এক যথার্থ অনুশীলন। প্রকৃত বিশ্বাসীদের পরিচয় আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন,

> "যারা তাদের সালাতে মনোযোগী" এবং (কোনো সালাত বাদ না দেওয়ার মাধ্যমে) "যারা তাদের সালাত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে"।

একনিষ্ঠভাবে এবং বুঝেশুনে সালাত আদায় করলে সালাতে মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়। এ ছাড়া এটা আত্ম-নিয়ন্ত্রণেরও ব্যাপার। সালাত পড়ার সময় ওই মুহূর্তের ভেতরেই অবস্থান করুন। সালাত পড়ার পরে কী করবেন অথবা ঘরের চাবিগুলো কোথায় রেখেছেন, এসব ভাবতে যাবেন না। আল্লাহর দিকে মন দিন এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক উন্নত করুন। আত্মিক প্রশান্তি অর্জনে এটাই সর্বোত্তম অনুশীলন। সালাত পড়ার সময় যদি এ আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করতে পারেন, তবে আপনি সঠিক পথের ওপরেই রয়েছেন।

এসবকিছুই টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য করে। টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য সবচে বেশি দরকার স্থিরতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং মনোযোগ। আর সালাত এসবগুলো ক্ষেত্রেই আমাদের প্রশিক্ষিত করে তোলে।

দু'আ ও বারাকাহ

> "তোমরা আমাকে ডাক, আমি অবশ্যই তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব। আর যারা অহংকারবশত আমার 'ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।"
>
> (সূরা অল-গাফির : ৬০)

মুসলিমরা একটি দিক দিয়ে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে। আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্কের মাধ্যমে একজন মুসলিমের সময়ে বারাকাহ আসে, যা আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনদের জন্য প্রযোজ্য নয়। বারাকার ধারণাটা ঠিকভাবে বোঝানোটা একটু কঠিন। বারাকাহ যেন একটি রহস্য, যা অদ্ভুতুড়ে কোনো উপায়ে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে। বারাকার ধারণা অনেকটা এমন: সাধারণত কোনো কিছু থেকে যা পাওয়ার কথা, সাধারণত সবাই যা পায়, তার চেয়ে অতিরিক্ত পাওয়া। যেমন, কেউ খুব অল্প বেতনের চাকরি করে। তবু প্রয়োজনীয় সবকিছুই সে কিনতে পারে এবং সুখে শান্তিতেই বসবাস করে। অপরদিকে এ লোকটির চেয়ে বেশি উপার্জন করা সত্ত্বেও অনেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেই হিমশিম খেয়ে যায়। অবশ্য এ ব্যাপারটা অনেকটা নির্ভর করে আপনি কীভাবে টাকা-পয়সা খরচ করেন তার ওপর। কিন্তু

অনেক সময় ধনী ব্যক্তিরও কার্যকরভাবে খরচ করার পরও নিজেদের আয়-ব্যয়ে কোনো বারাকাহ খুঁজে পান না।

বারাকার আরেকটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—দান করা। কুরআন বলছে, "... আল্লাহ দানকে বাড়িয়ে দেন.." এর অর্থ—যারা তাদের সম্পদ থেকে দান করেন আল্লাহ তাদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দেন। এ বিষয়টা এমনকি সেক্যুলারিস্টরাও প্রকৃতির এক রহস্যময় নিয়ম হিসেবে দেখে থাকে। তারা এটাকে বলে "Law of Attraction" অথবা "Law of Abundance"। এমনকি নাস্তিকরাও এ বিষয়টি নিজেদের জীবনে অনুভব করেছে। তারা দেখেছে দান করার ফলে কোনো না কোনোভাবে তাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এটাই বারাকার মূল কথা, একটি রহস্যঘেরা, অজানা উপায়ে বৃদ্ধি ঘটা, যা মানুষ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটা শুধুই আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার।

বারাকার এ ধারণা সময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেকে এক ঘণ্টায় তা করতে সক্ষম, যা অন্যেরা করতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। কারো কারো দশ মিনিটের বক্তৃতা যতটা তথ্যবহুল এবং জ্ঞানগর্ভ হয়, অনেকের এক ঘণ্টার আলোচনাও ততটা হয় না। ইসলামি জ্ঞানজগতে এরকম কিছু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইমাম আন-নাবাওয়ি। এ দুজন তাদের গোটা জীবনে যতগুলো বই লিখেছেন তার যোগফল তাদের পৃথিবীতে বসবাসের সময়ের চাইতেও বেশি। এত অল্প সময়ে এত গ্রন্থ রচনা করা রীতিমতো অসম্ভবই মনে হয়।

সন্দেহবাদীরা এসব ঘটনাকে অতিরঞ্জিত কিংবা বানোয়াট বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইমাম আন-নাবাওয়িদের বহুসংখ্যক রচনা তো এখনও আমাদের কাছে বিদ্যমান। এগুলো ভালোভাবে পড়ে শেষ করতে বছরের পর বছরের যত্নশীল অধ্যয়ন প্রয়োজন। আর এ রচনাগুলোর অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, অতীতের 'আলিমদের সময়ে বারাকাহ ছিল, প্রাচুর্য ছিল।

এখন নিশ্চয়ই এ ভাবছি :

আমরাও কীভাবে সময়ের এ বারাকাহ পেতে পারি? কী করতে পারি আমরা এ ঐশী সহায়তা পাওয়ার জন্য? যাতে করে একটি দিনে আমরা এত কিছু করতে পারি, যা মানবীয় ক্ষমতা দ্বারা অসম্ভব মনে হয়।

প্রাথমিকভাবে বলা যায়, আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে। জীবনের লক্ষ্যগুলো যেন এমন হয় যে তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। আল্লাহ যদি আমাদের জীবনযাপন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, আমাদের লক্ষ্যগুলো যদি হালাল হয়,

তবে অবশ্যই তাঁর পক্ষ থেকে আমরা সহায়তা পাব। সে সহায়তার ভেতরে আছে সময়ের বারাকাও।

আরেকটা বিষয় যেটা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, সেটা হলো দু'আ। দু'আর ক্ষমতাকে আমরা প্রায়ই অনুধাবন করি না এবং কাজেও লাগাই না তেমন একটি। আল্লাহ কুরআনে বলছেন, "আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো তোমাদের আহ্বানে।" অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ করা যায় কোনো ভায়া-মাধ্যম ছাড়াই। যখনই আল্লাহকে আমাদের প্রয়োজন, তখনই তাঁকে ডাকা যায়। তবু অনেকেই দু'আকে একটি আনুষ্ঠানিকতা বানিয়ে ফেলেছে। তারা চরম বিপদে পড়লেই শুধু দু'আ করে। আরও বাজে ব্যাপার হলো অনেকে আল্লাহকে না ডেকে মাজার কিংবা মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য কামনা করে।

দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়। এ মহাবিশ্বের সবকিছুই তাঁর অধীনে। এ দুটো সত্য অনুধাবন করা শুরু করলে দু'আ করা আপনার একটি অভ্যাসে পরিণত হবে।

দু'আ একজন বিশ্বাসীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দু'আ তার নিত্যদিনের কাজ। আর আল্লাহই তো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই সবকিছুতে তাঁর সাহায্য খুঁজুন। তাঁর কাছেই বলুন আপনার সময়ে বারাকাহ দিতে। আপনার লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য তাঁকেই বলুন। বলুন, আপনার লক্ষ্য পূরণের জন্য যা যা লাগবে তা যেন তিনি আপনাকে দেন। আল্লাহর দিকে ফিরুন, তাঁর অস্তিত্ব ও অসীম ক্ষমতাকে অনুভব করুন। আর তাঁর দানের ভান্ডারের দুয়ারে কড়া নাড়তে থাকুন।

যা যা করব :

আপনার আদর্শের যে যে জায়গাগুলো আপনি কখনই ছাড় দেবেন না; আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সেগুলোর একটি লিস্ট বানিয়ে ফেলুন। এ ধরনের লিস্ট আপনাকে স্থির এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে সাহায্য করবে। একজন মুসলিমের জন্য এ কাজটি সহজ। কারণ, তার জীবনাদর্শ কুরআন-সুন্নাহতে বেশ স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে সাজানো আছে। তার কাজ শুধু এগুলো ভালোভাবে জানা এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করা। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, সত্যবাদিতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্বশীলতা, সম্মানবোধ, সহানুভূতি এবং ক্ষমাশীলতা একজন মুসলিমের চিরাচরিত আদর্শ। একটি পরিপূর্ণ ও কর্মময় জীবন গড়ে তুলতে এবং জীবনের সমস্যাগুলো কমিয়ে আনতে এগুলো আমাদের সহায়তা করে ।

সারা দিনের কাজের পরিকল্পনা করার সময় সালাতের সময়গুলো আলাদা করে রাখুন। এ সময়গুলোকে মোটেও "ফাঁকা সময়" হিসেবে রাখবেন না। সালাতের

ব্যাপারে কোনো আপস নেই। মনে রাখবেন, সালাত হলো আল্লাহর প্রতি আমাদের একেবারে মৌলিক দায়িত্ব। সবকিছুর ওপরে সালাতকে প্রাধান্য দিতে হবে, এমনকি বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার ওপরেও। সালাত সবার আগে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় অভ্যাসে পরিণত হলে সালাতকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনের বাকি সবকিছু সাজানো সহজ হয়ে যায়। এর মাধ্যমে আমাদের সময়, আমাদের জীবন বারাকাময় হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই সুপ্ত প্রতিভা আছে। আল্লাহ প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র গুণাগুণ দিয়েছেন। নিজের প্রতিভাকে চেনার জন্য একান্তে কিছু সময় নিন। এ প্রতিভাকে কীভাবে উম্মাহর কল্যাণে কাজে লাগানো যায়, সেটাও ভাবুন। পাশাপাশি নিজের প্রতিভাকে উন্নত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করুন। পরিকল্পনা করতে থাকুন কীভাবে আপনার প্রতিভা কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারেন। আপনার সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে পেয়ে গেলে এরপর সিদ্ধান্ত নিন একে কীভাবে কাজে লাগাবেন। যেমন, ছোটবেলাতেই আমি বুঝতে পেরেছি আমি ভালো লিখতে পারি। তাই সব সময় চেয়েছি একজন লেখক হতে। আল-হামদু লিল্লাহ, আমি সেটাই করছি এখন! আপনিও পারেন! শুধু নিজের গিফটটা খুঁজে বের করুন।

লক্ষ্যগুলো ঠিক করুন এবং S.M.A.R.T করুন। অস্পষ্ট লক্ষ্য পূরণ হবার সম্ভাবনা কম। এ ছাড়া লক্ষ্যপূরণ হবার কতটুকু কাছে কিংবা দূরে আছেন সেটাও বোঝা যাবে না। প্রতিটা লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবসম্মত ও সময়মাফিক করে তুলুন, যতটা সম্ভব। এমন লক্ষ্যের দিকে মনোযোগী হন যা আল্লাহর কাছে প্রিয়, আপনার কাছে অর্থবহ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য উপকারী। এ ধরনের লক্ষ্যগুলোই শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে।

দ্বিতীয় ধাপ: গতানুগতিক জীবনধারা থেকে সুসংগঠিত জীবনে

ইঁদুর দৌড় : আত-তাকাসুর

আমরা হয়তো খেয়াল করি না যে, আমরা একটি ছোটাছুটির জীবনযাপন করছি। অনেকটা অটো-পাইলটের মতো, আকাশপথে চলছি ঠিকই কিন্তু কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি তার কোনো ক্লু নেই। একের পর এক কাজ করে যাচ্ছি শুধু রোবটের মতো।

অনেকের কাছে জীবন মানেই প্রতিযোগিতা। ছোটাছুটি আর ব্যস্ততা। কাজ, পরিবার, সামাজিক দায়বদ্ধতা, বিনোদন এবং প্রয়োজনীয় জিনিস জমাতে থাকা। একজন সাধারণ মানুষের প্রতিটা দিন ব্যস্ততায় ভরা। সারা দিনে শত কাজের ভিড়ে নিশ্বাস ফেলারও যেন সময় নেই। ব্যস্ততা, তাড়াহুড়োর ভিড়ে শূন্যতা আর হাহাকার আমাদের ঘিরে ধরে। অথচ এ থেকে বের হয়ে আসার কোনো উপায় যেন আমাদের জানা নেই। বাংলায় এ ধরনের ছোটাছুটিকে বলে 'ইঁদুর দৌড়', আর কুরআন একে বলছে, 'তাকাসুর'।

> "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রাখে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা কবরে পৌঁছাচ্ছ। না! তোমরা জানবে। আবারও, না! তোমরা জানবে। না! তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে! নিশ্চয়ই তোমরা জাহান্নাম দেখবে! তোমরা একে দেখবে নিজের চোখেই। এরপর, নিয়ামাত সম্পর্কে তোমাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে।"
>
> (সূরা আত-তাকাসুর: ১-৮)

আমরা সবাই জীবনের উপকরণগুলো নিয়ে ব্যস্ত। টেলিভিশন, ভিডিও গেমস, মুভি, গান, খেলাধুলা, কাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবার এবং সমাজ—এসবকিছু। আর এসবে আমরা এতই ডুবে আছি যে, আল্লাহকে নিয়ে, ইসলামকে

নিয়ে ভাবারই সময় আমরা পাই না। ইসলাম মেনে চলা বা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা তো দূরের কথা। আর এটাই ইঁদুর দৌড়, ছোটাছুটির জীবন। এর কথাই আল্লাহ ওপরের সূরায় বলেছেন। কী পরিমাণ সময় অপচয় করছি, এটা বুঝতে হলে কি মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করব নাকি?

না, আমরা চাইলে এখনই বদলাতে পারি। আর এক মুহূর্তও দেরি করার কোনো মানে নেই। মানে নেই ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখার। আমাদের জীবনের চাকাটা ঘোরাতে হবে, নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় যা কিছু আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে দিচ্ছে না, সে সবকিছুই জীবন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।

সহজ কথায়, এই ইঁদুর দৌড়ের জীবন থেকে এক ঘণ্টার জন্য ছুটি নিন। একবার নিজের জীবনের দিকে লক্ষ করুন। ভালো করে দেখুন আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আপনার জীবনযাত্রা কি আপনাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি অন্য কোথাও, নাকি কোথাও না?

যদি এমনটা আগে করে না থাকেন তা হলে এবার দেখবেন আপনি আসলে ভুল পথে চলছিলেন। সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছি যে, আমাদের জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়গুলো ভুলেই গিয়েছি।

টাইম ম্যানেজমেন্টের একটি মৌলিক সূত্র হলো, সময়কে আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন, সময় আপনাকে না। এজন্যই তো একে বলা হয় টাইম 'ম্যানেজমেন্ট'। সময়কে আমাদের 'ম্যানেজ' করতে হবে, যেভাবে অন্য সবকিছুকে 'ম্যানেজ' করি। এ ম্যানেজমেন্টের শুরু হয় দুটো জিনিসের মাধ্যমে—

- সময়ের মূল্যায়ন করা এবং
- এখন কীভাবে সময়কে ব্যবহার করছি তার মূল্যায়ন করা।

এরপর আসে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

সময় নিয়ে আমাদের ভাবনা

গবেষণায় দেখা গেছে, সময় নিয়ে মানুষের ভাবনা মূলত দুভাগে বিভক্ত। এ দুটো বিভাগ আমাদের দেখায়, একজন মানুষ কি টাইম ম্যানেজমেন্টে দক্ষ নাকি তার টাইম ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে। এ দুটো ভাগ হলো:

'in time' (মুহূর্তজীবী) আর 'through time' (সময়চারী)।

'মুহূর্তজীবী'রা প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করতে চেষ্টা করে। তারা সাধারণত অগ্রিম চিন্তাভাবনা করে না এবং ঠিক এই মুহূর্তে যা করছে তা উপভোগ করে। এ ধরনের মানুষেরা সাধারণত বেশি সুখী হয় এবং অন্যদের চেয়ে জীবন বেশি উপভোগ করে। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠে আবার, তারা সব জায়গায় দেরি করে, টাইম ম্যানেজমেন্টে তারা অদক্ষ। কারণ তারা অগ্রিম পরিকল্পনা করে না।

'সময়চারী'রা সময়কে বাক্সের মতো করে দেখেন। তারা প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি ঘণ্টা পরিকল্পনা করে এগিয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই সময়চারীরা টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে দক্ষ এবং সাধারণত কোথাও দেরি করেন না। এক্ষেত্রে মুদ্রার উল্টো পিঠ হলো, তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে এতই মনোযোগী থাকেন যে, এই মুহূর্তটাকে তারা আর উপভোগ করতে পারেন না।

সায়েদা হাবিব এ দুটো ভাবনার মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেছেন:

NLP অনুযায়ী সময়ভাবনা মূলত দুভাগে বিভক্ত। একজন মানুষ হয়তো বর্তমান মুহূর্তটাকে অনুভব করার চেষ্টা করেন অথবা সময়ের ভেতর দিয়ে পরিকল্পনা করে এগিয়ে যান। 'মুহূর্তজীবী'রা খুব একটি ভালো পরিকল্পনা করতে পারেন না এবং প্রায়ই দিশা হারিয়ে ফেলেন। তারা হয়তো কোনো একটি কাজে এত বেশি ডুবে যান যে, অন্য একটি মিটিং-এ উপস্থিত হতে দেরি করে ফেলেন। আর 'সময়চারী'রা পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে খুব দক্ষ। তাদের একটি গোছানো ডায়েরি থাকে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তারা অনেক সচেতন।

এখানে মূল কথাটা হলো এ দুটো ধারার মধ্যে 'ভারসাম্য' আনা। দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করতে হবে, ঘড়ির কাঁটা মেনে চলতে হবে, ঠিক আছে। কিন্তু বিনোদন বা পরিবারের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলোকে পরিকল্পনার ছকে না বেঁধে বরং উপভোগ করতে হবে। আপনি যে ধারারই হোন না কেন, ভারসাম্য আনতে হলে কিছু দক্ষতা শেখা এবং তা কাজে লাগানো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কেউ কেউ বলতে পারেন 'সময়চারী'রা এমনিতেই টাইম ম্যানেজমেন্টে এগিয়ে আছে। কিন্তু এটা সব সময় খাটে না। সময়চারীরা 'এখন'-এর চেয়ে 'একটু পর' নিয়ে বেশি ভাবিত থাকে। আর এজন্য তারা বিনোদন কিংবা বিশ্রামের সময়টাও ঠিকভাবে উপভোগ করতে পারেন না। তাই তাদেরকেও মুহূর্তজীবীদের মতো সময়ের সে ভারসাম্যটা খুঁজে পেতে হবে।

সময়-ব্যবহার সমালোচনা

একদিনের জন্য নিজের সমালোচক নিজেই হয়ে যান। আপনি আপনার সময়কে কীভাবে ব্যবহার করছেন, সেদিকটা একদিন মনিটর করুন। এভাবে একদিন প্রতিটা ঘণ্টাকে বিশ্লেষণ করার পর সেদিন রাতে রিপোর্ট হাতে নিয়ে বসুন। দেখুন কেমন গেল দিনটা। আমি নিশ্চিত আপনি চমকে যাবেন।

ঠিক কোন কোন সময় এবং কীভাবে আপনার সময়গুলো নষ্ট হচ্ছে, সেটা দেখতে পাবেন। এটা জেনে গেলে এরপর থেকে আরও ভালোভাবে সময়গুলো ব্যবহার করতে পারবেন। এ ধাপটাকে একদমই অবহেলা করবেন না। ৮০/২০ নীতি নামে একটি বিখ্যাত নীতি আছে। এ নীতি মাথায় রাখলে দেখবেন যে, অধিকাংশ মানুষই তাদের সময়ের সিংহভাগ অপচয় করে ফেলে আর অল্প একটি অংশ মাত্র কাজে লাগাতে পারে।

৮০/২০ নীতিটা মূলত অর্থনীতির বিষয়। এর মানে হলো আমাদের প্রতিদিনকার মাত্র ২০ ভাগ কাজ থেকে ৮০ ভাগ ফল অর্জিত হয়। আর ৮০ ভাগ কাজ মাত্র ২০ ভাগ ফল উৎপাদন করে। তাই যে কাজগুলোর প্রোডাক্টিভিটি বা উৎপাদনক্ষমতা বেশি, সেগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। একই সাথে বেশির ভাগ সময় নষ্টকারী কাজগুলোও চিহ্নিত করতে হবে।

৮০/২০ নীতির অনেক উদাহরণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই পাওয়া যাবে। যেমন, সালাত শুধু দিনে পাঁচবার পড়তে হয় কিন্তু এর আত্মিক প্রভাব সারা দিনের অন্যান্য কাজ থেকে বেশি। আবার আমরা তিন বেলা খাই। কিন্তু সারা দিন চলার শক্তি আসে এ তিন বেলা খাবার থেকেই।

এমনকি কর্মজীবনেও কিছু কাজের গুরুত্ব অন্যসব কাজ থেকে বেশি। ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আমরা যে সময়টুকু দিই, সে সময়টুকু প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য কাজে ব্যয় করা সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নিজেকে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া যথেষ্ট অথচ এর প্রভাব জীবন বদলে দেওয়ার মতো। কিন্তু আমাদের জীবনে কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব না ফেলেই প্রাতিষ্ঠানিক কাজগুলোর পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় চলে যেতে পারে।

আমাদের জীবনে ছোট ছোট অনেক কাজের প্রভাব লম্বা লম্বা কাজগুলোর চেয়ে বেশি। আমাদের গোটা জীবন এ ছোট ছোট কাজগুলো দিয়েই গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা এ বিষয়টা তেমন খেয়ালই করি না। এ বিষয়টা গুরুত্বসহ নিলে জীবনের মোড়টাই বদলে যায়। কারণ, তখন ঠিক জায়গায় সময়টাকে কাজে লাগানো যায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধরুন, আপনি শিক্ষকতা করেন এবং শিক্ষকতাই আপনার সবচে প্রোডাক্টিভ কাজ। আগে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা মাত্র ক্লাস নিতেন। কিন্তু এখন প্রতি সপ্তাহে ক্লাসের সংখ্যা আরও বাড়াবেন এবং ক্লাসগুলো আরও মানসম্মত করার চেষ্টা করবেন। তা হলে সময় নষ্টকারী বা অযথা কিছু কাজ বাদ দিতে পারেন। সে সময়টা বরং শিক্ষকতা করানোতে দিতে পারেন।

আবার ধরুন, আপনার চারটা ব্যবসায়িক বিনিয়োগ রয়েছে। কিন্তু সবচে ছোট ব্যবসাটা থেকেই বেশি লাভ আসছে। এক্ষেত্রে ওই ছোট ব্যবসায়ের পেছনে আপনার সময় এবং অর্থ দেওয়া উচিত এবং অন্য যে ব্যবসাগুলো থেকে কোনো লাভই হচ্ছে না, সেগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিতে পারেন।

দেখুন, ৮০/২০ নীতিটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এমনকি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও কাজের এবং অকাজের, সময় নষ্টের জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। ৮০% এবং ২০% কিন্তু বাঁধাধরা না, এটা শুধুই একটি সংখ্যাজোড়। ৮০/২০ নির্দেশ করে যে কাজগুলোতে আমরা খুব কম সময় দিই, সাধারণত সেগুলোর প্রভাব আমাদের জীবনে অন্য কাজগুলোর চেয়ে বেশি। এ নীতিটির মাধ্যমে আপনার প্রতিদিনের কাজগুলোর একটি মূল্যায়ন করে ফেলুন, তখন নিজেই এর ফলাফল দেখতে পাবেন।

এই যে সময়ের হিসাব নেওয়া, নজরদারির মধ্যে রাখা, এ ব্যাপারটা ইসলামেও আছে। সময় নষ্ট না করা, প্রতিটা ঘণ্টার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা—গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি মূল্যবোধ। এসব অনেকটা মুহাসাবাহর সাথে মিলে যায়।

মুহাসাবাহর বাংলা অর্থ হতে পারে, আত্ম-পর্যবেক্ষণ অথবা নিজের হিসেব নিজে নেওয়া। নিজের নিয়্যাত আর হৃদয়কে সব সময় পর্যবেক্ষণ করতে থাকার পদ্ধতি হলো মুহাসাবাহ । মুহাসাবাহর এ ধারণা আমরা টাইম ম্যানেজমেন্টেও নিয়ে আসতে পারি। কারণ, প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সময়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ।

টাইম ম্যানেজমেন্টের পদ্ধতি

যদি আপনার সময় ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইতোমধ্যে মুহাসাবাহ করে থাকেন, তা হলে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন যে, দিনে আপনার কমপক্ষে ৪-৬ ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। সামনে আপনাদের এমন কিছু পদ্ধতির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব, যেগুলো অনুসরণ করলে সময় আর এভাবে নষ্ট হবে না।

Contents

আমাদের সবার জীবনযাপনের ধরন ভিন্ন। তাই টাইম ম্যানেজমেন্টেরও সর্বজনীন কোনো পদ্ধতি নেই। অর্থাৎ একটি পদ্ধতি সবার ক্ষেত্রে খাটবে না। আমি এখানে আমার অভিজ্ঞতা মোতাবেক টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য সবচে কার্যকর পদ্ধতিগুলো তুলে ধরব এবং ঠিক কোন ব্যক্তিত্বের সাথে কোন পদ্ধতি যায়, সেটাও উল্লেখ করব।

সাপ্তাহিক পরিকল্পনা পদ্ধতি

টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রথম যে পদ্ধতিটা আমি গ্রহণ করি সেটা ছিল 'সাপ্তাহিক পরিকল্পনা পদ্ধতি'। এ পদ্ধতির কথা জানতে পারি স্টিফেন কভের '7 Habits of Highly Effective People' বই থেকে। টানা দুই বছর, ২০১৪ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলাম। পদ্ধতিটি আমার জন্য খুব কার্যকরী ছিল। সবকিছু ঠিকঠাকমতো ব্যবস্থা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ সেরে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সাপ্তাহিক পরিকল্পনা পদ্ধতির মূল কথা হলো, সপ্তাহের সাতটি দিনের প্রতিটা ঘণ্টার কাজের একটি লিস্ট করে রাখা।

পদ্ধতিটির ভালো দিক হলো

এর মাধ্যমে আপনার সামনের দিনগুলোর করণীয় আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। কখনো অলস বসে থাকবেন না বা এরপর কী করবেন, তা নিয়ে ভাবনায় থাকবেন না। এখানে সবকিছুই পরিষ্কার এবং নিয়মতান্ত্রিক। আপনি যদি খুব গোছানো, পেশাদার কোনো ব্যক্তি হন, তবে সাপ্তাহিক পরিকল্পনা পদ্ধতি আপনার জন্যই।

এ পদ্ধতির প্রধান সমস্যা হলো প্রশস্ততার অভাব। সমস্যাটি সমাধানের জন্য আমি পরবর্তী সময়ে প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় হাতে রেখে পরিকল্পনা করেছি। এই এক ঘণ্টা আমি সে কাজগুলো করব যেগুলো আমি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারিনি। তারপরও একটু ব্যস্ত জীবনযাপনকারীদের জন্য এ পদ্ধতিটি মেনে চলা কঠিন। যেমন কর্মজীবী মা, হোম-স্কুলিং করছেন এমন অভিভাবক এবং সারা দিন নানা রকম মিটিং এ ব্যস্ত থাকা লোকজন। তাই তাদের জন্য আরেকটি পদ্ধতির কথা তুলে ধরছি।

টু-ডু লিস্ট

একটি ভালো টু-ডু লিস্টের গুরুত্ব মোটেই অবহেলা করা যাবে না। আমি টু-ডু লিস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা শুরু করি ২০১৩-এর শেষের দিকে। সে সময় আমার ওপর কাজের চাপ বাড়ছিল কিন্তু টু-ডু লিস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে বেশ ভালোই উপকার পেয়েছিলাম। ২০১৪ সালে টু-ডু লিস্টকেই আমার টাইম ম্যানেজমেন্টের মূল পদ্ধতি

হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। সাপ্তাহিক পরিকল্পনা পদ্ধতি তখনও ছিল কিন্তু অনেকটা গৌণ হিসেবে।

টু-ডু লিস্টের সবচে সুন্দর দিক হলো—এটা বানাতে সময় লাগে মাত্র পাঁচ মিনিটের মতো। কিন্তু এর মাধ্যমে অনেকগুলো সময় অপচয় হওয়া থেকে বেঁচে যায়। আমি বার্ষিক, মাসিক, সাপ্তাহিক এবং প্রতিদিনকার টু-ডু লিস্ট টাইপ করে রাখি। এতে করে বাড়তি সময় আর অপচয় হয় না। যদিও প্রধানত আমি প্রতিদিনকার টু-ডু লিস্টটাকেই টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য ব্যবহার করি।

যাদের প্রতিদিনই ব্যস্ততায় কাটে কিন্তু সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সাজানোর মতো সময় নেই, তাদের জন্য টু-ডু লিস্ট পদ্ধতি বেশ কার্যকরী। টু-ডু লিস্ট রিমাইন্ডারের মতো কাজ করে, আপনাকে মনে করিয়ে দেয় কী কী কাজ করা বাকি। তা ছাড়া একটি কাজ শেষ করে টু-ডু লিস্টে ওই কাজটির ঘরে টিক চিহ্ন দেওয়ার প্রশান্তিটা বেশ উপভোগ্য।

টু-ডু লিস্ট তৈরি করা খুব সোজা। আগামী দিন কী কী করবেন সেগুলো একে একে লিখে ফেলুন। এরপর কোনটি আগে করবেন এবং কোনটি পরে, এ ভিত্তিতে কাজগুলো ক্রমানুসারে সাজান। তারপর আগামী দিন লিস্ট অনুযায়ী কাজ করুন এবং কাজ শেষে টিক চিহ্ন দিয়ে দিন।

যারা টাইম ম্যানেজমেন্টে একটু প্রশস্ততা খোঁজেন অর্থাৎ একটু ফ্লেক্সিবিলিটি চান, তাদের জন্য টু-ডু লিস্ট পদ্ধতি একেবারে যথার্থ। কিন্তু এ পদ্ধতিটা কাঠামোগত দিক থেকে একটু দুর্বল। যদি একটু খামখেয়ালি ধরনের হন অথবা টু-ডু লিস্ট চেক করতে ভুলে যান, তা হলে খুব একটি লাভবান হবেন না। আর সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হবে পরের পদ্ধতিটা।

হাইব্রিড বা মিশ্র পদ্ধতি

এখন আমি ওপরের দুটো পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি হাইব্রিড পদ্ধতি ব্যবহার করছি। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমি সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমার জন্য টু-ডু লিস্ট পদ্ধতিটা সবচে বেশি কার্যকরী, তবে সাথে সাপ্তাহিক পরিকল্পনা পদ্ধতিকে পাশে রেখে।

অতএব, এখন আমার মূল কাজ হলো টু-ডু লিস্টে থাকা প্রতিদিনকার কাজগুলো সেরে নেওয়া। সাথে অতিরিক্ত একটু সংযোজন রয়েছে। আর সেটা হলো, কাজের তালিকার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর জন্য সময় নির্ধারিত করে দেওয়া। যেমন, সকাল ৯টা-১২টা বাচ্চাদের হোম-স্কুলিং, ৩-৪টা আমার বই লেখা। এতে করে আমার

প্রথম দিনের মূল্যায়ন:

সকাল ৬টা	ঘুম থেকে ওঠা, ব্রেকফাস্ট করা, কাপড় পাল্টানো
সকাল ৭টা	কাজে যাওয়ার পথে ট্রাফিকে বসে থাকা
সকাল ৮টা	সহকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময়, গতকাল রাতের ফুটবল ম্যাচ নিয়ে আলোচনা, মেইল চেক করা
সকাল ৯টা	এখনও মেইল চেক করছি, ইউটিউব ভিডিও দেখলাম, একটা ফোনকল ধরেছি
সকাল ১০টা	কিছু কাজ করা
বেলা ১১টা	স্টাফ মিটিং-এ অংশ নেওয়া–মিটিং-এর টপিক মনে করতে পারছি না
দুপুর ১২টা	লাঞ্চ-ব্রেক
দুপুর ১টা	যুহরের সলাত পড়া, মিটিং কেমন বোরিং হয়েছিল সহকর্মীদের সাথে এ নিয়ে খানিকক্ষণ কথা বলা
বেলা ২টা	কিছু কাজ করা
বেলা ৩টা	কিছু ইউটিউব ভিডিও দেখা, রাতের খাবারে কী থাকছে জানতে বাসায় ফোন করা
বিকেল ৪টা	কী করেছি মনে নেই, আসলে এত ক্লান্ত ছিলাম যে কিছুই করিনি
বিকেল ৫টা	বাসায় ফেরার পথে ট্রাফিকে বসে থাকা
সন্ধ্যা ৬টা	খবর এবং খেলার পুনঃপ্রচার দেখা
সন্ধ্যা ৭টা	ডিনার করা
রাত ৮টা	কিছু সময় হাবিজাবি ভিডিও দেখা

প্রথম দিনের মূল্যায়ন: একটু ভিন্নভাবে

সকাল ৬টা	ঘুম থেকে ওঠা, ব্রেকফাস্ট করা, পোশাক পাল্টানো (ফজর পড়ার জন্য আরো এক ঘণ্টা আগে উঠতে হবে)
সকাল ৭টা	কাজে যাওয়ার পথে ট্রাফিকে বসে থাকা (কিছু করার নেই, সময়টা নষ্ট হবেই)
সকাল ৮টা	সহকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময়, গতকাল রাতের ফুটবল ম্যাচ নিয়ে আলোচনা, মেইল চেক করা (আরো ভালো কাজে লাগাতে পারতাম)
সকাল ৯টা	এখনও মেইল চেক করছি, ইউটিউব ভিডিও দেখলাম, একটা ফোনকল ধরেছি (১০ মিনিটের কাজ করতে ২ ঘণ্টা লাগিয়েছি)
সকাল ১০টা	কিছু কাজ করা (আরো বেশি পরিমাণে করতে হবে)
বেলা ১১টা	স্টাফ মিটিং-এ অংশ নেওয়া–মিটিং-এর টপিক মনে করতে পারছি না (পরের বার আরো মনোযোগ দিতে হবে)
দুপুর ১২টা	লাঞ্চ-ব্রেক (আরো ভালোভাবে কাজে লাগানো যেত)
দুপুর ১টা	যুহরের সলাত পড়া, মিটিং কেমন বোরিং হয়েছিল এ নিয়ে সহকর্মীদের সাথে খানিকক্ষণ কথা বলা (সলাত পড়েই সরাসরি কাজে চলে যাওয়া উচিত ছিল)
বেলা ২টা	কিছু কাজ করা (আরো বেশি পরিমাণে করতে হবে)
বেলা ৩টা	কিছু ইউটিউব ভিডিও দেখা, রাতের খাবারে কী থাকছে জানতে বাসায় ফোন করা (আরো ১ ঘণ্টা অপচয়)
বিকেল ৪টা	কী করেছি মনে নেই, আসলে এত ক্লান্ত ছিলাম যে কিছুই করিনি (এসময়ে ক্লান্তি এড়ানোর একটা উপায় খুঁজতে হবে)
বিকেল ৫টা	বাসায় ফেরার পথে ট্রাফিকে বসে থাকা (কিছু করার নেই)
সন্ধ্যা ৬টা	খবর এবং খেলার পুনঃপ্রচার দেখা (বাচ্চাদেরকে সময় দেওয়া উচিত ছিল)
সন্ধ্যা ৭টা	ডিনার করা
রাত ৮টা	কিছু সময় হাবিজাবি ভিডিও দেখা
রাত ৯টা	এখনো হাবিজাবি ভিডিও দেখছি
রাত ১০টা	হাবিজাবি ভিডিও দেখতে দেখতেই ঘুমিয়ে পড়েছি
রাত ১১টা	(মোট ৪ ঘণ্টা টিভি দেখার পেছনে অপচয় করেছি। এটা যদি ২ ঘণ্টায় নামিয়ে আনতে পারি তা হলে ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ২ ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। অবসরে করার মতো ভালো কিছু বের করতে হবে)।

নষ্ট হওয়া সময়গুলো চিহ্নিত করার পর এবং আগের তালিকাগুলো ঘষামাজা করে এখন যা দাঁড়িয়েছে:

ভোর ৫টা	ঘুম থেকে ওঠা, ফজর পড়া, কুরআন পড়া, ব্যায়াম করা
সকাল ৬টা	ব্রেকফাস্ট করা, কাপড় পাল্টানো, কাজের জন্য বের হওয়া
সকাল ৭টা	কাজে যাওয়ার পথে ট্রাফিকে বসে গাড়ির অডিওতে বা নিজের ফোনে রাখা লেকচার শোনা
সকাল ৮টা	সহকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময়, মেইল চেক করা, সারাদিনের সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের লিস্ট তৈরি করা
সকাল ৯টা	কাজের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করা
সকাল ১০টা	আরও কিছু কাজ করা
বেলা ১১টা	স্টাফ মিটিং-এ অংশ নেওয়া—মিটিং-এর আলোচনার নোট নেওয়া
দুপুর ১২টা	লাঞ্চ-ব্রেক
দুপুর ১টা	যুহরের সলাত পড়া, সহকর্মীদের সাথে কাজ সম্পর্কিত নতুন কিছু ধারণা শেয়ার করা
বেলা ২টা	কিছু কাজ করা
বেলা ৩টা	আসরের সলাত পড়া, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এমন কিছু আর্টিকেল পড়া
বিকেল ৪টা	সারাদিনের কাজ গুছিয়ে নেওয়া, আগামী কালকের কাজগুলোর একটা লিস্ট তৈরি করা
বিকেল ৫টা	বাসায় ফেরার পথে ট্রাফিকে বসে অডিওবুক শোনা
সন্ধ্যা ৬টা	মাগরিবের সলাত পড়া, বাচ্চাদের সময় দেওয়া
সন্ধ্যা ৭টা	পরিবারের সবাই একসাথে ডিনার করা
রাত ৮টা	একটা বই পড়ে এরপর ঈশার সলাত আদায় করা
রাত ৯টা	স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো
রাত ১০টা	আধ ঘণ্টা টিভি দেখে ঘুমিয়ে গেছি

প্রতিদিনের কাজের মূল্যায়ন ফর্ম:

তারিখ/সময়	যা করেছি	যেভাবে উপকৃত হয়েছি	ব্যয়িত সময়	গুরুত্বের মাত্রা
১ অগাস্ট, ২০২০ সকাল ৮টা	মেইলের জবাব দিয়েছি	কাজ সেরে ফেলেছি, মেইল জমা হতে দিইনি	৩ ঘণ্টা	মধ্যম
১ অগাস্ট, ২০২০ বেলা ১১টা	ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারে সময় কাটিয়েছি	মেইলের জবাব দেবার পর একটু অবসর নেবার প্রয়োজন ছিল	১ ঘণ্টা	খুব অল্প
১ অগাস্ট, ২০২০ দুপুর ১টা	বোর্ড মিটিং-এ অংশ নিয়েছি	আগামী সপ্তাহের মূল লক্ষ্য এবং কার্যবিধি নির্ধারণ করেছি	২ ঘণ্টা	উচ্চ
১ অগাস্ট, ২০২০ সন্ধ্যা ৬টা	টিভি দেখেছি	বিশ্রাম করেছি	৪ ঘণ্টা	খুব অল্প
২ অগাস্ট, ২০২০ সকাল ৮টা	মেইলের জবাব দিয়েছি	অনেক ক্লান্তিকর একটা কাজ আগে-ভাগে সেরে নিয়েছি	১ ঘণ্টা	মধ্যম
২ অগাস্ট, ২০২০ সকাল ৯টা	একটা বই পড়েছি	জ্ঞান ও দক্ষতা বেড়েছে	১ ঘণ্টা	উচ্চ
২ অগাস্ট, ২০২০ সকাল ১০টা	একটা প্রজেক্টের রূপকল্পের প্রস্তাবনা খসড়া করেছি	আমার আইডিয়াগুলো অবশেষে লিখিত রূপ পেয়েছে; এখন কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা যাবে	২ ঘণ্টা	উচ্চ

রুটিন আর বাঁধাধরা রইল না বরং আগের চেয়ে অনেক প্রশস্ত বা ফ্লেক্সিবল হয়েছে। এর সুবিধা হলো হঠাৎ কোনো জরুরি কাজ সামনে এসে পড়লে সে কাজটিকেও রুটিনে জায়গা করে দেওয়া যাবে। এ পদ্ধতিটাই এখন আমি ব্যবহার করছি। আমার মতে, আরও ভালো কিছু পাওয়ার আগপর্যন্ত এ পদ্ধতিটাই সবচে ভারসাম্যপূর্ণ।

এখন আমরা জেনেছি ঠিক কোথায়, কখন এবং কীভাবে আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। একইসঙ্গে আমাদের কাছে এখন এমন কিছু কৌশল ও পদ্ধতি আছে যা ব্যবহার করে আমরা সময় নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা জানব কীভাবে প্রাধান্যের ক্রম ঠিক করতে হয়, এবং কার্যকর টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব।

যা যা করব

এক দিনের জন্য, ওইদিন আপনি যা যা করেছেন তা ডায়েরিতে লিখে রাখুন। এরপর সেগুলোকে প্রতি ঘণ্টার কাজ হিসেবে সাজান, যাতে করে দেখা যায় আপনি ওইদিন প্রতি ঘণ্টায় কী কী কাজ করেছেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এর একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

এরপর সন্ধ্যায় ডায়েরি হাতে বসুন এবং মূল্যায়ন করুন। খুঁজে বের করুন, আপনার কত ঘণ্টা সময় প্রোডাক্টিভ ছিল, কত ঘণ্টা সময় অপচয় হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে।

তা ছাড়াও প্রতিদিনকার কাজের মূল্যায়ন ফর্মটা ব্যবহার করে আপনার কাজগুলো কতটা ভালোভাবে হয়েছে সেটা নির্ণয় করতে পারেন। এই ফর্মটা বইয়ের শেষে দেওয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষে উদাহরণটাও দেখতে পারেন।

এ অধ্যায়ে টাইম ম্যানেজমেন্টের তিনটা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এক সপ্তাহ করে প্রতিটা পদ্ধতি পরখ করে দেখুন। এরপর নিজেই বিবেচনা করুন কোনটা আপনার জন্য সবচে ভালো। বইয়ের শেষে সংযুক্ত টেমপ্লেটগুলো এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন।

তৃতীয় ধাপ: কাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন?

যথাযথভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ হলো অগ্রাধিকার বুঝতে না পারা। আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোকে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দিতে শিখলে আমাদের চিন্তাভাবনা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তখন দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক রুটিন সাজানোও সহজ হয়ে যায়। কারণ, আমরা এখন জানি কোন কাজগুলো এ রুটিনে অবশ্যই থাকবে।

অগ্রাধিকার ঠিক করতে জানা একজন বিশ্বাসীর জীবনে অপরিহার্য। পাঁচবার সালাত আদায়ের চমৎকার পদ্ধতিটি আমাদের শেখায় আল্লাহকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে। এ পদ্ধতিটা জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। হোক সেটা ব্যক্তিগত জীবন অথবা আমাদের ক্যারিয়ার, কোথাও না কোথাও কোনো কিছুকে অন্য কিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারটা থেকেই যায়।

খানিকটা চিন্তাভাবনা আর অল্প একটু টাইপিং, অগ্রাধিকারের জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে এতটুকুই দরকার। এটুকু কষ্ট করাই যায়। কারণ, পরবর্তী সময়ে এর ফলাফল শুধু ভালো টাইম ম্যানেজমেন্টই না, বরং সুস্থ-সুন্দর হৃদয় ও মন।

অনেকেই এ ছোট কাজটুকুও করার জন্য সময় দেন না আর এর ফলাফল হলো অনেক অনেক সময়ের অপচয়। অগ্রাধিকার দিতে হয় এমন বিষয়গুলোকে, যেগুলো পৃথিবী এবং আখিরাতে আপনার সুখ এবং সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই জীবনকে বিশৃঙ্খল করে, এমন জায়গাগুলোতে সময় দেওয়ার চেয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর পেছনে সময় দেওয়াটা বেশি যুক্তিসংগত ।

স্টিফেন কভে তার '7 habits of highly effective people' বইতে 'জরুরি' আর 'গুরুত্বপূর্ণ' এ দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অনেকেই তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি কাজকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেন, যেখানে বিষয়টা মোটেও ওরকম না। আপনি যে লেখাটা এখন লিখছেন অথবা যে বইটি পড়ছেন, তা আপনার ফোনে মাত্র আসা কল, মেসেজ অথবা নোটিফিকেশনের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও

আমরা অনেকেই জরুরি কাজে সময় এবং মনোযোগ দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিই। এটা শুধুই যে সময় নষ্ট করে তা না, মনোযোগও সরিয়ে দেয়। তারপর আগের কাজটায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

স্টিফেন কভে বলেছেন,

> "সফল মানুষেরা সুযোগ খোঁজেন, তারা সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকেন না। তারা সুযোগগুলোকে বেড়ে উঠতে দেন আর সমস্যাগুলো দমিয়ে রাখেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয় প্রতিরোধমূলক।"

তাই 'জরুরি' আর 'গুরুত্বপূর্ণ' এ দুয়ের পার্থক্য জানতে হবে। আর এজন্য দরকার জীবনের অগ্রাধিকারগুলোর ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা। মুসলিম হিসেবে আমাদের কিছু সাধারণ অগ্রাধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রতিটা মানুষই স্বতন্ত্র, তার দক্ষতার জায়গাগুলোও ভিন্ন। আর তাই জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রাধিকারগুলোও ভিন্ন হবে।

জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাট্রিক্স

জরুরি গুরুত্বপূর্ণ নয়	জরুরি গুরুত্বপূর্ণ
জরুরি নয় গুরুত্বপূর্ণও নয়	জরুরি নয় গুরুত্বপূর্ণ

এ ডায়াগ্রামটা জরুরি/গুরুত্বপূর্ণ ম্যাট্রিক্সের একটি উদাহরণ। আমাদের কাজগুলো এ ম্যাট্রিক্সের চার ক্যাটাগরির কোনো না কোনো একটিতে পড়ে। সেগুলো হয় জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি নয় অথবা জরুরি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনোটিই নয়। জরুরি কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া অনুচিত, কারণ এতে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো অবহেলিত হয়।

জরুরি এবং একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদাহরণ হলো, এ সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করতে হবে এমন কোনো কাজ। কাজটি গুরুত্বপূর্ণ বটে কিন্তু সময়সীমা থাকায় একইসাথে জরুরিও। এসব ক্ষেত্রে কৌশল হলো, ফেলে না রেখে কাজটি দ্রুত সেরে ফেলা।

গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি নয় এমন কাজের উদাহরণ হলো, দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যগুলো। যেমন, এ বইটি লেখা। বইটি লেখার ব্যাপারে আমার তাড়া ছিল না। কিন্তু আমি প্রতিদিন অল্প অল্প করে হলেও লিখেছি, কারণ এটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এখানেই আমরা অনেকে ভুল করে বসি। গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি না, এমন কাজগুলো চিহ্নিত করতে আমরা ভুল করি। এসব কাজ করার সঠিক ধরন হলো—প্রতিদিন এসব কাজের জন্য অল্প হলেও সময় বের করা। ব্যক্তিগত উন্নয়ন, পড়াশোনা, অধ্যয়ন, দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য এসবের জন্য সময় নির্ধারিত করে নিন। যদি একসময় এগুলো জরুরি কাজে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, তা হলে কখনোই এগুলো করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

জরুরি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমন কাজগুলো হলো মূলত মনোযোগ বিচ্ছিন্নকারী জিনিসগুলো। যেমন, ফোন কল, মেসেজ অথবা কারো সাথে কথা বলা। অনেকে মনে করে প্রতিটা কল রিসিভ করতে হবে এবং প্রতিটা মেসেজের দ্রুত একটি জবাব দিতে হবে। এটা ভুল ধারণা।

এভাবে করা হলে আমাদের সময় নষ্ট হবে, কাজের গতি কমে যাবে। এ বিষয়ে সামনের কোনো অধ্যায়ে আলোচনা করব—কীভাবে এসব কাজ সামলাতে হয়। আপাতত এটুকু জেনে রাখা যায় যে, এক ঘণ্টা ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা, ফোন কলের উত্তর দেওয়া কিংবা বন্ধুর সাথে চ্যাট করা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আমরা জরুরি নয় এবং একই সাথে অগুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর কথা বলব। এসব কাজের মধ্যে পড়ে—টেলিভিশন দেখা, ভিডিও গেমস খেলা আর ইন্টারনেট ব্রাউজ করা। এ কাজগুলো কখনোই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর সামনে আসা উচিত না। বরং অবসর বিনোদনের জন্য রেখে দেওয়া উচিত। এসবের চেয়ে আমাদের জীবনের লক্ষ্যগুলো অনেক বড়।

স্টিফেন কভে খুব সুন্দরভাবে এ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন :

"জরুরি কাজগুলো সাধারণত দৃশ্যমান। তারা আমাদের চাপ দিতে থাকে, কাজে নেমে পড়ার জন্য জোর দেয়। এগুলো সাধারণত সবার ক্ষেত্রেই জরুরি কাজ। এরা আমাদের চোখের সামনেই থাকে এবং প্রায়ই এ কাজগুলো আনন্দদায়ক, সহজ এবং মজার হয়। কিন্তু এগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অগুরুত্বপূর্ণও বটে।

অপরদিকে কোনো কাজের গুরুত্ব তার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। আমাদের জীবন, বিশ্বাস এবং লক্ষ্য পূরণে ভূমিকা রাখলেই কেবল কোনো কিছুকে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়।

আমরা জরুরি কাজগুলোর প্রতিই বেশি সাড়া দিই। গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি না এমন কাজগুলো বেশি বেশি করা উচিত, এগুলোতে আরও বেশি সক্রিয় হওয়া উচিত। আমাদের সুযোগকে আঁকড়ে ধরতে হবে আর তখনই আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নগুলো পূরণ হতে শুরু করবে।"

নিচের ডায়াগ্রামে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদাহরণসহ ভাগ করে ম্যাট্রিক্সে দেখানো হলো:

জরুরি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয় যেমন সাধারণ মেইলের জবাব দেওয়া বা যে কারও ফোন রিসিভ করা	জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ এই সপ্তাহে নির্ধারিত কোনো ডেডলাইন মিট করা বা নির্দিষ্ট কোনো মিটিং এ উপস্থিত হওয়া
জরুরি নয় গুরুত্বপূর্ণও নয় অফিসের সর্বশেষ চলতে থাকা কোনো গুজব বা কানাঘুষায় অংশগ্রহণ	গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি নয় কোনো বই লেখার কাজ করা কিংবা অনেক পরে শেষ হবে এমন কোনো প্রকল্পের কাজ

এখন আশা করি আমরা জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের পার্থক্য বুঝতে পেরেছি। তা হলে চলুন এবার এমন কিছু কাজ দেখি, যা আমাদের জীবনে গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার পাবে। সাধারণভাবে আমরা আমাদের অগ্রাধিকারগুলোকে পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি: ধর্মীয়, ক্যারিয়ার, পারিবারিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত।

ধর্মীয় অগ্রাধিকার

এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারগুলো ইতোমধ্যেই নির্ধারিত করে দেওয়া আছে অর্থাৎ মাথা খাটিয়ে বের করার প্রয়োজন নেই। এগুলোর জন্য সময় বের করতে হবে কেবল। তা ছাড়া প্রতিটা মুসলিমের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারগুলো মোটামুটি একই। যেমন:

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মতো পড়া:

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। তাই অগ্রাধিকারের তালিকায় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সালাত আল্লাহর সাথে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম, আমাদের মন্দ প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে অন্যতম সহায়ক। সালাত আমাদের শৃঙ্খলাবোধ এবং মনোযোগ অর্জনে সাহায্য করে। আর একজন বিশ্বাসীর জীবনে সালাত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি 'ইবাদাত।

কুরআন তিলাওয়াত :

কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করাটা বাধ্যতামূলক না হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি 'ইবাদাত। আর এ কাজটি ১০ মিনিটের জন্য হলেও করা উচিত। কুরআন তিলাওয়াত আমাদের অগ্রাধিকার ও দায়িত্বগুলো মনে করিয়ে দেয়, ঈমান বৃদ্ধি করে, হৃদয়কে প্রশান্ত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বয়ে আনে।

ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা :

প্রতিটা মুসলিমের উচিত প্রতিনিয়ত ইসলামের জ্ঞান বাড়ানোর চেষ্টা করা। অধিকাংশ মানুষ যথেষ্ট সময় না থাকার অজুহাত দেয়। কিন্তু টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটি বই পড়ার সময় আপনি আর সে অযুহাত দিতে পারেন না। কিছু বই, লেকচার আর কোর্সের একটি সিলেবাস তৈরি করে ফেলুন। এরপর প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা ইসলামের জ্ঞান অর্জনের পেছনে দিন।

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য :

এটা ধর্মীয় আবশ্যক কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমরা একটি অন্য ক্যাটাগরিতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

ক্যারিয়ার-সংক্রান্ত অগ্রাধিকার

আমাদের ক্যারিয়ারের সাথে সম্পর্কিত অগ্রাধিকারগুলো মোটামুটি নিচের প্রকারগুলোতে ভাগ করা যায়। একেকজনের জন্য ব্যাপকতার ক্ষেত্রে আর গুরুত্ব অনুসারে এ প্রকারভেদে ভিন্নতা ঘটতে পারে।

স্বল্পস্থায়ী কাজ :

এ কাজগুলো খুব অল্প সময়ে দ্রুততার সাথে সেরে ফেলা উচিত। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার মাঝে এসব কাজ যেন বাধা সৃষ্টি না করে।

দীর্ঘস্থায়ী কাজ :

এক্ষেত্রে আমরা অনেকেই ভালোভাবে টাইম ম্যানেজ করতে ভুল করি। নির্ধারিত সময় শেষ হতে আরও দুই মাস সময় বাকি আছে দেখলে আমরা আরও গড়িমসি করি। এভাবে শেষমেশ কাজটি আর সুন্দরভাবে করাও হয়ে ওঠে না। এখানে সমাধান হলো আগেভাগে পরিকল্পনা করা।

প্রথমে দীর্ঘস্থায়ী কাজের ডেডলাইনগুলো চিহ্নিত করা উচিত। এরপর প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট সময় কাজটির জন্য বরাদ্দ রেখে কাজ করে গেলে দেখবেন নির্ধারিত

সময়ের আগেই আপনার কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবং শুধু শেষ না, খুব ভালোভাবেই শেষ করতে পারবেন। এতে করে কাজের চাপ এবং দুশ্চিন্তাতেও পড়বেন না।

পেশাগত উন্নয়ন :
চারপাশের এত এত জরুরি কাজ এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভিড়ে আমরা আমাদের পেশাগত উন্নয়ন নিয়ে সহজেই আত্মতুষ্টিতে ভুগি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে হলে পেশাগত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর এজন্য প্রতিদিন কিছু সময় নির্ধারিত করা উচিত, এমনকি প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট করে হলেও। বই এবং আর্টিকেল পড়া, সেমিনারে অংশগ্রহণ করা এসবের মাধ্যমে নিজেকে নিয়মিত উন্নত করতে হবে এবং এভাবে একজন পেশাজীবী হিসেবেও দক্ষ হয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

আপনার যোগ্যতা যত বাড়বে, চাকরির সুযোগও তত বেশি আসবে, একইসাথে আপনার স্যালারিও ভালো হবে। বাস্তবতা হলো, পেশাগত দক্ষতাই আপনার সামনের জীবনে সবচে বেশি কাজে আসবে। কিন্তু খুব কমই আমরা এ বিষয়টাকে আমলে নেই।

পারিবারিক অগ্রাধিকার

এটা বেশ সহজ। অগ্রাধিকারের ধরন নির্ভর করবে আপনার পারিবারিক কাঠামোর ওপর।

জীবনসঙ্গী :
আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য প্রতিদিন সময় বের করুন। এটা করার সবচে ভালো উপায় হলো, বাচ্চাদের সাথে বেডটাইমটা আগে সেরে নেওয়া। ওরা ঘুমিয়ে যাবার পর একটি অখণ্ড ও সুন্দর সময় আপনার স্বামী/স্ত্রীর সাথে ব্যয় করুন।

এটা হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বহুবিবাহের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটবে। এসব ক্ষেত্রে টাইম ম্যানেজমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে সব স্ত্রীর জন্যই সময় বের করতে হবে এবং সবাইকেই সমান সময় দিতে হবে।

সন্তান-সন্ততি :
অনেকে নিজের বাচ্চাদের সাথে একদমই সময় কাটান না। হয় এড়িয়ে যান অথবা নানা রকম গ্যাজেট দিয়ে ওদের ডুবিয়ে রাখেন, যাতে বাচ্চারা বিরক্ত না করে। ভুলে গেলে চলবে না, আপনার সন্তানেরাই এ পৃথিবীতে এবং আখিরাতের জন্য আপনার সর্বোত্তম বিনিয়োগ। তাদের আপনি সবচে ভালো যে উপহারটা দিতে পারেন, সেটা হলো আপনার সময়।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আপনার কাজ শেষে এক ঘণ্টা সময় আপনার বাচ্চাদের জন্য রাখুন। ওদের সাথে আনন্দময় সময় কাটান। এভাবে আপনাদের সম্পর্কে একটি পরিবর্তন দেখতে পাবেন, একইসাথে এর মাধ্যমে ওদের বেড়ে ওঠাটাও ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে।

বাবা-মা:

তাদের সাথে একই বাসায় থাকলে তাদের জন্য প্রতিদিন সময় বের করুন। আর যদি একইসঙ্গে না থাকেন, তা হলে ফোনে যোগাযোগ করুন এবং সপ্তাহে অন্তত একবার তাদের দেখতে যান। তাদের অবহেলা করবেন না। কারণ, তাদের সন্তুষ্টিতেই আপনার জান্নাত পাওয়া সহজ হবে। বাবা-মাকে সময় দেওয়া প্রত্যেকের জীবনেই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

ভাই-বোন:

আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের জীবন নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের ভাই-বোনরাও তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে দূরত্ব তৈরি হয়। মুসলিম হিসেবে আমাদের অবশ্যই পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করার ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। এজন্য নিজেদের মধ্যে মেসেজিং করা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত থাকা এবং সময় সময় একে অপরকে দা'ওয়াত দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সামাজিক কর্তব্য

সমাজে কোনো না কোনোভাবে ভূমিকা রাখতে ইসলাম আমাদের উৎসাহিত করে। কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় আমরা অনেকেই সমাজ থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়ি। কমপক্ষে যে সামাজিক কর্তব্যগুলো আমাদের পালন করা উচিত সেগুলো হলো:

দা'ওয়াহ:

ইসলামের বার্তা অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া প্রতিটা মুসলিমের জন্য আবশ্যক। অনেকভাবেই আমরা এটা করতে পারি। এটা হতে পারে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ইসলাম নিয়ে কিছু পোস্ট করে অথবা আপনার প্রতিবেশী কিংবা সহকর্মীর সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে। যাই হোক না কেন, দা'ওয়াহ আমাদের জীবনের অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে অবশ্যই যেন থাকে।

সামাজিক সেবা :

আপনার নিজের এলাকাতে সমাজসেবামূলক কোনো কাজে অংশ নিতে পারেন। যদি বেশি সময় দিতে পারেন তা হলে তো ভালোই, না পারলে অল্প সময় হলেও দিন। এলাকার ভেতরে এমন অনেক কাজ রয়েছে, যাতে আপনি অন্ততপক্ষে সপ্তাহে একদিন হলেও সময় দিতে পারবেন। যদি এমন কোনো কাজ না পান, তা হলে আমার পরামর্শ হলো আপনি নিজেই কোনো সেবামূলক কাজের উদ্যোগ নিন।

ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার

এ জায়গায় অবহেলার পরিমাণ অন্য সব জায়গার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা অন্যের জন্য কাজ করতে, ক্যারিয়ার নিয়ে পাগলামিতে এতই ব্যস্ত থাকি যে, নিজেদের জন্যই আমাদের তেমন একটি সময় বাকি থাকে না। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের দিকে আমরা তেমন একটি মনোযোগ দিতে পারি না। কিন্তু এভাবে কখনই মানসিক প্রশান্তি আসবে না। আমাদের নিত্য দুশ্চিন্তা ও কোলাহল থেকে মুক্তি পেতে কিছু ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারের জায়গা ঠিক করতে হবে। আর প্রতিদিন একটু একটু করে উন্নত হবার চেষ্টা করে যেতে হবে। আর এজন্য যে কাজগুলো করতেই হবে, সেগুলো হলো :

পর্যাপ্ত ঘুম এবং খাওয়া :

বেশি ঘুম এবং খাওয়া যেমন ক্ষতিকর, কম হলেও তেমনি। অতিরিক্ত ঘুম এবং খাওয়া আমাদের স্নায়ুকে দুর্বল করে তোলে, আলস্য সৃষ্টি করে। আবার অল্প পরিমাণ হলে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে, সতেজ ভাবটা থাকে না। এক্ষেত্রে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কত ঘণ্টা ঘুম আপনার লাগবেই (সাধারণত অনেকের ক্ষেত্রে ৬-৮ ঘণ্টা), আর সেভাবেই ঘুমের সময় ঠিক করুন।

আর খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে পরিমাণের চেয়ে কী খেলেন এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট সবচে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই ব্রেকফাস্ট কখনোই মিস করবেন না। সারা দিন সতেজ এবং প্রাণবন্ত থাকার জন্য সকালের খাবারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বিনোদন এবং বিশ্রাম :

অনেকে মনে করে মুসলিম হওয়া মানেই সারাক্ষণ ভালো কাজে ব্যস্ত থাকা, বিনোদন কিংবা বিশ্রামের জন্য কোনো সময়ই না থাকা। অথচ ব্যাপারটা মোটেও এমন না। ইসলামি জীবনাচারের পরিসীমার ভেতরেই হালাল বিনোদনের যথেষ্ট জায়গা আছে।

তা ছাড়া মানুষ হিসেবেই আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। যথেষ্ট বিশ্রাম এবং বিনোদন না পেলে আমাদের সজীবতা হারিয়ে যায়।

তাই নিজের জন্য মানানসই কোনো বিনোদনের উপায় খুঁজে নিন। এরপর সেটার জন্য একটি সময় বরাদ্দ করুন। (গড়ে একজন মানুষের ১-২ ঘণ্টা বিনোদনের দরকার হয়)।

ব্যক্তিগত উন্নয়ন :

আমাদের জীবনে উন্নতির অনেক জায়গা আছে। এমন সুপ্ত প্রতিভা আমাদের মাঝে আছে, যা দিয়ে আমরা চমৎকার সব কাজ করতে পারি। কিন্তু যতটা মনোযোগ দিলে অনেক কিছু করা সম্ভব হতো, এ জায়গায় আমরা ঠিক ততটা মনোযোগ দিচ্ছি না।

আমার পরামর্শ থাকবে—প্রতিদিন ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ত্রিশ মিনিট সময় রাখা। এসময় নিজেকে নির্জনে কিছু সময় দেওয়া উচিত।

আচ্ছা, ব্যক্তিগত উন্নয়ন আসলে কী? এ বইটিই সম্ভবত এর একটি ভালো উদাহরণ।

ব্যক্তিগত উন্নয়ন মানে নতুন কোনো স্কিল আয়ত্ত করা অথবা এমন কোনো জ্ঞান অর্জন করা, যা আপনার জীবনমান এবং ব্যক্তিত্বকে উন্নত করবে। যেমন, আত্মিক প্রশান্তি, চাপ নিয়ন্ত্রণ, টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ।

ব্যক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মূলত আমার এ বইটি লিখতে শুরু করা। সাধারণ মানুষের কাছে, যাতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের একটি যথাযথ সিলেবাস থাকে, সে প্রেরণা থেকেই আমি ধারাবাহিক বই লেখার পরিকল্পনা করি। এ সিরিজের বইগুলো তাদের সে চাহিদাটা পূরণ করবে, এটাই মূল ইচ্ছা ছিল।

প্রতিদিন কিছু সময় আত্মোন্নয়নে ব্যয় করলে নিজের মাঝেই বিশাল এক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন কীভাবে আপনি প্রতি বছর আগের চেয়েও উন্নত হয়েছেন, আর নিজের এ পরিবর্তন অবশ্যই আপনার কাছেও ভালো লাগবে।

সব অগ্রাধিকারই কি রাখা সম্ভব

আপনি হয়তো ভাবছেন, আমাদের জীবনে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো এতগুলো জায়গা, সবগুলোর জন্য কি সময় করে নেওয়া সম্ভব আদৌ? আসলে এগুলো তেমন কিছুই না। টাইম ম্যানেজমেন্ট যখন আপনার হাতের মুঠোয় এসে যাবে, তখন এর চেয়ে তিনগুণ বেশি কাজ আপনি করতে পারবেন।

এখানে মূল কথা হলো, প্রতিটা কাজের জন্য সময় বের করা। খাতা-কলম (ল্যাপটপ অথবা ট্যাব) নিয়ে বসে ঠিক করুন সপ্তাহের কোন দিন কোন সময়ে

কাজগুলো করবেন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনি সবগুলো কাজ করারই সময় পাবেন। এরপরও অনেক সময় বাকি থেকে যাবে যেগুলোতে ইমেইল এবং কলের উত্তর দিতে পারবেন।

যেসব ফাঁদ এড়িয়ে চলবেন

আমাদের অগ্রাধিকার অনুযায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু ফাঁদ এড়িয়ে চলতে হবে। এ ফাঁদগুলো সাধারণত যেমন হয়:

জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হওয়া:

আগেও বলেছি আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাজের চেয়ে জরুরি কাজকে বেশি প্রাধান্য দিই। হয়তো ফোন-কলটা অত জরুরি ছিল না, ফেসবুক নোটিফিকেশনটা তো অবশ্যই জরুরি না। প্রতিবার মোবাইলের আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে মোবাইল চেক করার অভ্যাসটা দমন করতে শিখুন।

আমার জোর পরামর্শ থাকবে—কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দেওয়ার সময় মোবাইল সাইলেন্ট অথবা সুইচড অফ করে রাখবেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা কল ব্যাক করার জন্য সময় আপনি পাবেন। তাই তৎক্ষণাৎ এসবে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সাথে সাথে ফোন না ধরার জন্য আমরা অনেকেই বিব্রতবোধ করি। কিন্তু এর কোনো প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ মানুষই বুঝে নেয় যে, আপনি হয়তো ব্যস্ত আছেন। না বুঝলেও ধীরে ধীরে এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং আপনার নির্ধারিত সময়েই আপনাকে কল করবে।

হাতের কাজটি মন দিয়ে না করা

কোনো কাজে দক্ষতা বাড়াতে হলে, সে কাজে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। কাজটি স্থিরতার সাথে এবং নিজের মধ্য থেকে করতে হবে। মনোযোগ দেওয়া আমাদের অনেকের জন্য বিশাল এক সমস্যা। এর একেবারে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সালাত। সালাত আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করার সবচে ভালো প্রশিক্ষণের জায়গা হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের অনেকেরই সালাতের মাঝে মনোযোগ থাকে না। মন যেন তখন সালাত ছাড়া আর বাকি সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে এতটাই ভুলোমনা হয়ে পড়ি যে, ভুলেই যাই কোন সূরাটা পড়ছিলাম অথবা কততম রাকা'আতে ছিলাম।

মনোযোগী হতে পারা একটি স্কিল। এ দক্ষতা অর্জন করতে দরকার নিয়মিত চর্চা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। আর এটা চর্চা করার সবচে ভালো জায়গা হলো সালাত। বুঝেশুনে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মনোযোগী হওয়ার যাত্রায় অনেক দূর এগিয়ে

যাওয়া সম্ভব। সালাতে আপনি যেসব সূরা পড়ে থাকেন সেগুলোর অর্থ জেনে নিন, সূরাগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করুন। এরপর সালাতে ওই সূরাগুলো পড়ার সময় মন দিয়ে পড়ুন। একটি সময় এ অভ্যাসটা ফোকাস অর্জন করতে আপনাকে সাহায্য করবে। আর সালাত থেকে প্রাপ্ত এ অভ্যাস আপনার জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলোতে সহায়তা করবে।

মন এক জায়গায় না থাকলে ভালোভাবে এবং দ্রুত কাজ শেষ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মনকে এক জায়গায় স্থির রেখে কাজ করলে কাজটি ভালোভাবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যেই শেষ হয়। একটু পর কী করবেন, এসব নিয়ে ভাবতে যাবেন না। গতকাল এবং আগামীকাল দুটোই ভুলে যান এবং হাতের কাজটি মন দিয়ে করুন। তা হলে কাজটি ঠিক মনমতোই হবে।

নিজের এবং নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য সময় বের না করা

আমি এটা নিয়ে আগেও বলেছি এবং আবার বলাটা বাহুল্য মনে করছি না। আপনিই আপনার সবচে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। নিজের অর্থ-সম্পদ, ক্যারিয়ার এবং সন্তানদের প্রতি যেমন নিবেদিত থাকেন, নিজেকে আরও উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রেও তেমন হয়ে উঠুন। নিজের চাহিদাগুলোকে একদমই অবহেলা করবেন না। নিজেকে সময় দিন। এমন না করলে বার্ন-আউট, অমনোযোগিতার স্বীকার হবেন। এমনকি গুনাহে জড়িয়ে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে।

প্রতি ঘণ্টায় মন হালকা করার জন্য পাঁচ মিনিটের একটি বিরতি নিন। তারপর পরবর্তী কাজে লেগে পড়ুন। দুপুরের খাবারের সময় কাজ থেকে বিরতি নিয়ে আল্লাহর 'ইবাদাত করুন এবং নিজেকে আরেকবার জাগিয়ে তুলুন। আবার সন্ধ্যায়ও বাসায় এমন একটি নির্জন সময় কাটান, একটু মজা করুন এবং সতেজ হয়ে যান। আবার একটু ভালোভাবে তাজা হয়ে উঠতে চাইলে কয়েক মাস পরপর পরিবারের সাথে ছুটি কাটান। অবশ্যই প্রতিদিন নতুন নতুন স্কিল শেখার জন্য সময় বের করতে ভুলবেন না, নিশ্চিত থাকুন এজন্য কখনো আফসোস করবেন না।

একটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যগুলো অগ্রাহ্য করা

জীবনের কোনো একটি দিক নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না, যাতে অন্য দিকগুলো অবহেলিত হয়। কিছু মানুষ তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, পরিবারকে সময় দিতে পারেন না। আবার কেউ সন্তানদের প্রতি বেশি মনোযোগী হতে গিয়ে জীবনসঙ্গীর কথা ভুলে যান। কিন্তু সবচে বেশি ঘটে—অন্য সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে নিজেকেই বঞ্চিত করা।

Contents

এমনকি ইসলাম মেনে চলার ক্ষেত্রেও রাসূল (সা.) আমাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে বলেছেন। 'ইবাদাতে আমাদের এতটা প্রান্তিক হয়ে যাওয়া উচিত না, যার কারণে পরিবার, কাজ এবং সর্বোপরি আমাদের নিজেদেরই অবহেলা করে বসব। নিচের হাদিসে রাসূল (সা.) এ ধরনের প্রান্তিকতাকে চরমপন্থা হিসেবে অভিহিত করেছেন:

একবার তিনজন সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের কাছে এসে তাঁর 'ইবাদাত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাদেরকে যখন তা জানানো হলো তারা অবাক হলেন। কারণ, তার পরিমাণ তাদের ধারণার চেয়ে ঢের কম ছিল। তারা ভেবেছিলেন তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে দিবারাত্র নামায-রোযাতেই কাটান। কখনো রাতে ঘুমান না এবং কোনো দিন বিনা রোযায় কাটান না। পরক্ষণে তারা ভাবলেন, তার তো এত বেশি 'ইবাদাতের দরকার নেই। আল্লাহ তা'আলা তাকে নিষ্পাপ রেখেছেন, তার কোনো গুনাহ নেই। তাই খুব বেশি 'ইবাদাত করা তার দরকার নেই। অন্যরা তো তার মতো নয়। তাদের অনেক গুনাহ হয়ে যায়। তাই তাদেরই বেশি বেশি 'ইবাদাত করতে হবে। একজন বললেন, 'আমি রাতভর নামায পড়ব। কখনো ঘুমাব না।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি জীবনভর প্রত্যেক দিন রোযা রাখব।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারীসঙ্গ পরিহার করে চলব। কখনো বিয়ে করব না।' তাদের একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা এই এই কথা বলেছ?' 'শোনো, আমি কিন্তু আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। তাই তোমাদের চেয়ে তাকে ভয়ও বেশি করি, অথচ আমি কোনো দিন রোযা রাখি এবং কোনো দিন রাখি না। আমি নামাযও পড়ি এবং ঘুমাইও আর আমি বিবাহও করেছি। (এটাই আমার সুন্নাহ ও নিয়ম)। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ উপেক্ষা করে সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

তাই সুখ এবং সাফল্যের চাবি হলো ভারসাম্য। জীবন হলো আল্লাহর অধিকার, সৃষ্টির অধিকার এবং আপনার সত্তার আপনার নিজের প্রতি অধিকারের এক ভারসাম্য। নিচের হাদিস থেকে নেওয়া ঘটনাটি এ কথাটাই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে:

নবি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (হিজরাতের পর মাদীনায়) একজন মুহাজির ও একজন আনসারকে ভাই বানিয়ে দিতেন। তিনি সালমান ও আবু দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। তারপর সালমান একদিন আবু দারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ি) গেলেন। তিনি দেখলেন আবু দারদার স্ত্রী উম্মে দারদা মলিন কাপড় পরে আছেন। তিনি তাকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই।' (ইতোমধ্যে) আবু

দারদাও এসে গেলেন এবং তার জন্য খাবার তৈরি করলেন। তারপর তাকে বললেন, 'তুমি খাও। আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি খাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি খাব না।' সুতরাং আবু দারদাও (নাফ্‌ল রোযা ভেঙে দিয়ে তার সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর রাতের বেলা আবু দারদা নাফ্‌ল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নাফ্‌ল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' শেষমেশ রাতের শেষাংশে তিনি বললেন, 'এবার উঠে নাফ্‌ল নামায পড়ো।' তারা দুজনে একত্রে নামায পড়লেন। তারপর সালমান তাকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার নিজ সত্তারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব, তুমি অধিকারগুলো দাও।' তারপর তিনি নবি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সালমান ঠিকই বলেছে।'

যা যা করব

আপনার জীবনে অগ্রাধিকার পাবে, এমন ২০টি বিষয়ের একটি লিস্ট তৈরি করুন। এই লিস্টটাতে অগ্রাধিকারের পাঁচটি ক্ষেত্রই থাকতে হবে, সালাত থেকে শুরু করে অফিসের কাজ পর্যন্ত। আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ই বাদ দেবেন না।

এই লিস্টটাকে 'দৈনিক' এবং 'সাপ্তাহিক' কাজের হিসেবে ভাগ করুন। লিস্ট দেখে এখন আপনি এটা রিভিউ করে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন। রিভিউ করার সময় সব কাজকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজান, এরপর দেখুন কোন কাজগুলো আপনি প্রতিদিন করবেন আর কোনগুলো সপ্তাহে একবার। যেমন সালাত আপনার দৈনিক অগ্রাধিকারের তালিকায় সবার ওপরে থাকবে। পরিবার নিয়ে ঘুরতে বের হওয়া, বাবা-মার সাথে দেখা করা অথবা কোনো সাপ্তাহিক রিপোর্ট জমা দেওয়া আপনার সাপ্তাহিক অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে।

প্রতিদিনের কাজগুলোর জন্য প্রতিদিন আর সাপ্তাহিক কাজগুলোর জন্য সপ্তাহে একবার সময় বের করুন। এভাবে 'সাপ্তাহিক পরিকল্পনা' ক্যালেন্ডারটা সাজান। প্রতিদিনের কাজের জন্য সময় নির্ধারিত করুন আর সাপ্তাহিক কাজের জন্য সপ্তাহের একটি দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করুন। যেমন, শুক্রবার ফজরের পর সূরা আল-কাহফ পাঠ করা। এভাবে সাজালে আপনার দিনগুলো আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। দেখবেন যে, সব অগ্রাধিকার পূরণ করার মতো সময় তো আপনি পাচ্ছেনই, বিনোদন আর বিশ্রাম নেওয়ার জন্যও অনেক সময় পেয়ে যাবেন। এর কারণ আমরা

যখন বড় বড় কাজগুলোর জন্য সময় গুছিয়ে নিই, ছোট ছোট কাজগুলোর জন্য সময় এমনিতেই বের হয়ে আসে। যদিও বিপরীতটা ঘটবে না।

সেসব জরুরি কাজগুলোর একটি লিস্ট তৈরি করুন, যা খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং পরেও করা সম্ভব। জন ক্যানফিল্ড তার 'The Power of Focus' বইতে অগুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর জন্য একটি সমাধান দিয়েছেন। এটাকে বলা হয় 4-D সমাধান। এর মূল কথা হলো কোনো কাজ যদি অগ্রাধিকার পাওয়ার মতো না হয় তা হলে:

- Dump it, যদি কারোর এটা করার প্রয়োজন না পড়ে তা হলে বাদ দিন।
- Delegate it, যদি এটা অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারেন তো করিয়ে নিন।
- Defer it, যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয়, তা হলে পরে করুন।
- Do it, যদি এটা জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে করে ফেলুন।

যে কাজগুলো বাদ দেওয়া কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে করানো সম্ভব সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অনর্থক জমিয়ে রাখি। এ কাজগুলোর পেছনে অযথাই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় অপচয় হয়। এ ধরনের কাজগুলো চিহ্নিত করুন আর সমাধান অনুযায়ী কাজ করুন, দেখবেন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর জন্য অনেক সময় বেঁচে যাচ্ছে।

হাতের কাজটি মন দিয়ে করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। মনোযোগ দেওয়া একটি অভ্যাসের মতো এবং যেকোনো অভ্যাসের মতোই এজন্য দরকার চর্চা। সামনের অধ্যায়ে আমরা পুরোনো বদঅভ্যাস ছেড়ে কীভাবে ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে হয় এ নিয়ে আলোচনা করব। টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মন দিয়ে করলে যেকোনো কাজই দ্রুত এবং ভালোভাবে করা সম্ভব হয়। এলোমেলোভাবে কাজ করতে গেলে অনেক সময় লাগে এবং কাজও হয় অল্প। তাই কোনো কিছুতে ফোকাস কীভাবে করতে হয় শেখার চেষ্টা করুন, খুব কাজে দেবে।

চতুর্থ ধাপ: পদক্ষেপ নেওয়া

"কবরে শায়িত কত মানুষ নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কেননা তারা হয়তো বলেছিল, 'আমি এটা আগামীকাল করব'।"

গড়িমসি করা

আমি যখনই টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রসঙ্গ তুলে আনি সবার মুখে আমি একটি সমস্যার কথাই শুনতে পাই, Procrastination বা গড়িমসি। অধিকাংশ মানুষই নির্ধারিত সময়ে তাদের কাজ শেষ করতে না পারার কারণ হিসেবে বলেছে, 'আমি অলসতা করি'। গড়িমসি করার এ অভ্যাসটাকে কেন যেন জীবনের একটি অংশ হিসেবেই দেখা হয়, যেন এটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কিছু যেটা কখনোই পাল্টানো যাবে না। আসলে এসব কিছুই না, সবই ধোঁকা।

গড়িমসি করা একটি অভ্যাসজাত আচরণ এবং খুব বাজে অভ্যাসই বটে। যাহোক, অন্য সব বদঅভ্যাসের মতোই এটাও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। তবে এজন্য দরকার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, আত্মপ্রত্যয় এবং বদলে যাওয়ার একটি কারণ।

একটি বদভ্যাস বদলে একটি ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার মতো সক্ষমতা সবার মধ্যেই আছে। প্রয়োজন শুধু সত্যকার অনুপ্রেরণা। আশা করছি এ অধ্যায়ে বদঅভ্যাস বদলানোর মতো অনুপ্রেরণা পেয়ে যাবেন।

গড়িমসি করা বন্ধ করতে হলে সবার আগে এর মূল কারণগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানা প্রয়োজন। এ কারণ মূলত চারটা:

লক্ষ্যের অভাব

এ বিষয়ে আগের অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্যগুলোই সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রধান অনুপ্রেরণা। এ লক্ষ্যগুলোই আমাদের প্রতিদিন সামনের দিনগুলোর জন্য উজ্জীবিত করে তোলে।

যাদের যথাযথ লক্ষ্য নেই, তারা জীবনে কোনো কিছুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রেরণা খুঁজে পায় না। ফলস্বরূপ তারা ভালোভাবে কোনো কাজ করতে পারে না, সঠিক সময়ের মধ্যে করা তো দূরের কথা। জীবন যেন তাদের কাছে একের পর এক বাধা পেরুনো, যে বাধাগুলো তারা অল্প পরিশ্রমে অতিক্রম করতে পারলেই বাঁচে। তাই তারা সব কাজ শেষ মিনিটের জন্য রেখে দেয় এবং কাজের মান নিয়ে মোটেও ভাবিত হয় না।

গড়িমসি করার এ স্বভাব তাড়াতে হলে সবার আগে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। এ লক্ষ্যগুলোই আপনাকে আলস্য ঝেড়ে কাজে নেমে পড়তে প্রেরণা জোগাবে।

ধোঁকা

ভালো কাজ ও তাওবা করার ক্ষেত্রে শয়তান সবাইকে এক ধরনের ধোঁকায় ফেলে দেয়। গড়িমসি বা আলস্যে ফেলে ভালো কাজ এবং তাওবা করা থেকে বিরত রাখে। 'বুড়ো বয়সে তাওবা করে নেব' হলো এ ধরনের প্রতারণামূলক বাক্যের সার্থক উদাহরণ। পরে কাজ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে—এটা ভেবে আমরা আসলে নিজেদেরই বোকা বানাই।

তাওবা করার ক্ষেত্রে এ ধরনের আলস্য খুব মারাত্মক হতে পারে; এ জীবনে এবং আখিরাতেও। যদিও এমন মানসিকতার প্রয়োগ আমরা আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই করে চলেছি। আমরা মনে করছি—এসাইনমেন্টটা জমা দেওয়ার, রিপোর্ট সাবমিট করার অথবা মিটিং-এর নোট তৈরি করার এখনও অনেক সময় আছে। শেষমেশ দেখি আর বেশি সময় নেই।

এরপর আমরা তাড়াহুড়ো করা আরম্ভ করি। এর সাথে যুক্ত হয় দুশ্চিন্তা, ভয় এবং হতাশা। সব মিলিয়ে আমাদের কাজ গিয়ে পৌঁছে শেষ মুহূর্তের দোটানায় আর কাজের মানও হয় খারাপ।

এখানে মূল কথা হলো 'পরে' করার ভুল ধারণাটা অনুধাবন করতে পারা। মুসলিম হিসেবে আমরা জানি, ভবিষ্যতের কোনো কাজের ব্যাপারে "ইন শা আল্লাহ" (যদি আল্লাহ চান) বলতে হয়।

> "এবং কখনো বলো না আমি অগামীকাল কাজটি করব, ইন শা আল্লাহ বলা ব্যতীত।" (সূরা আল-কাহফ ২৩-২৪)

"ইন শা আল্লাহ" এ কথাটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ভবিষ্যৎ আল্লাহর হাতে। আর তাই আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখা উচিত না। আমরা জানি না ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। আমাদের উচিত চোখের

সামনের পর্দা তুলে বাস্তবতা অনুধাবন করা। আর বাস্তবতা হলো আলস্যে নষ্ট হওয়া একটি মুহূর্তও আমরা আর ফিরে পাব না। কাজে নেমে পড়ার সময় এখনই, আগামীকাল নয়।

অতিরিক্ত নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা

Procrastination-এর আরেকটা বড় কারণ হলো Perfection. এ কারণেই লেখালেখি জীবন আরম্ভ করতে যেয়ে আমি প্রচুর গড়িমসি করেছি। আমি সব সময় চেয়েছি একজন লেখক হতে এবং বই লিখেই আমার দিনগুলো পার করতে।

অসংখ্য আইডিয়া ছিল আমার, অনেক খসড়া দাঁড় করিয়েছি, বহু সারাংশ আর 'প্রথম অধ্যায়'ও লিখেছি। কিন্তু এর বেশি আমি এগোতে পারিনি। কারণ, আমার লেখা যথার্থ হতে হবে, খাঁটি হতে হবে এই অযাচিত ভূত আমাকে পেয়ে বসেছিল।

আমার কাছে নিজের লেখাগুলোকে মনে হতো ভুলে ভরা এবং সেগুলোর গুরুতর সম্পাদনা প্রয়োজন। মনে হতো এ লেখা কেউ পড়বে না। এভাবে বিধ্বস্ত মনে হাল ছেড়ে দিতাম আর একটি ছেড়ে আরেকটা লেখায় হাত দিতাম। শতভাগ নির্ভুল হতে চাওয়া আমার লেখাগুলো শেষ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

একদিন ভাবলাম নির্ভুল হতে চাওয়ার এ চিন্তাটা বেশ বাজে। আমি একজন মানুষ, আর মানুষের লেখনী কখনোই শতভাগ নির্ভুল হবে না। প্রাথমিক লেখা অবশ্যই জগাখিচুড়ি ধরনের হবে। আর এ কারণেই আমরা সম্পাদনা করি, লেখা সম্পাদকের কাছে পাঠাই এমনকি পুনর্মার্জিত সংস্করণ বের করি।

উপলব্ধি করলাম যে, যদি আমি লেখালেখিতে ক্যারিয়ার করতে চাই তা হলে আমাকে নির্ভুল হবার অপচেষ্টা বাদ দিয়ে লিখে যেতে হবে। যা মনে আসে লিখে ফেলব, কাটাছেঁড়া মোছামুছি পরে করা যাবে। এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর আমার গড়িমসি করা বন্ধ হলো এবং লেখালেখিও একটি গতি পেল।

আপনিও হয়তো আপনার কোনো লক্ষ্যে পিছিয়ে আছেন, কারণ আপনি ভাবছেন এটা এখনও নির্ভুল হয়নি। এসব ক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটিই রাস্তা। আপনাকে বুঝতে হবে যে, নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়। যেকোনো মানবীয় কাজে ভুল হওয়াটাই রীতি। যথার্থ হওয়াটা বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য হলো যথাসাধ্য চেষ্টা করা। তাই নির্ভুল হতে চাওয়ার ইচ্ছেটা ছেড়ে দিন, নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করুন।

জন পেরি তার The Art of Procrastination বইয়ে এ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন:

Contents

কোনো কাজ হাতে নেওয়ার সময় একটি "মোটামুটি নির্ভুল" কাজ করার লাভ এবং ক্ষতির হিসাবটা আগে ভাগে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নিজেকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে: এ জায়গায় নির্ভুলভাবে কাজ করতে যাওয়ার উপযোগিতা কতটুকু? মোটামুটি কাজ করলে যা হতো, সেখানে নির্ভুল কাজ করার চেষ্টা করে কি খুব বেশি লাভ হবে? আমি এ কাজটি মোটামুটি নির্ভুলভাবে করতে পারব এর সম্ভাবনাই বা কতটুকু? এটা করলে বা না করলে আমার বা অন্যদের জন্য কেমন পরিবর্তন বয়ে আনবে? আদৌ কি আনবে?

প্রায় ক্ষেত্রে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর হবে: একটি "মোটামুটি নির্ভুল" কাজ একদম নির্ভুল কাজ করার চেয়ে ভালো। আর এমনিতেই আমি সেটুকুই করতে পারব। কাজেই আমি একটি মোটামুটি নির্ভুল কাজ করার জন্য নিজেকে ছাড়পত্র দিচ্ছি। পুরোপুরি নির্ভুল করতে গিয়ে কাজের সময়সীমা অতিক্রম করে ফেলার চেয়ে এটাই ভালো। যার মানে আমি এখনই কাজটি শুরু করতে পারি (বা অন্ততপক্ষে আগামীকাল)।

তাৎক্ষণিক তৃপ্তি পেতে চাওয়া

আমাদের মনস্তত্ত্ব এখন তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির প্রতি বেশি আসক্ত। আমরা দ্রুত সবকিছু পেতে চাই। আধুনিক বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাও ভোক্তাদের মাঝে এ অভ্যাস আরও ছড়িয়ে দিয়েছে। বুঝতে শেখার পর থেকেই একটি শিশুকে দীর্ঘস্থায়ী অর্জনের চেয়ে তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এই মানসিকতা নিয়েই আমরা বেড়ে ওঠি। এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে আমাদের জীবনে।

অনেক মুসলিমই ব্যভিচারের মতো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি পেতে যেয়ে। বিয়ের মতো দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক এবং এর সাথে জড়িত দায়িত্ব তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। একইভাবে দ্রুততম সময়ে টাকা উপার্জন করতে চাওয়া, ধনী হতে চাওয়া এমনকি খিলাফাহ ও জান্নাতের পথেও শর্টকাট বেছে নিয়েছে অনেকেই।

বর্তমান সময়ে এবং ইসলামের ইতিহাস জুড়ে যতগুলো চরমপন্থি সংগ্রাম হয়েছে, সবগুলোর পেছনে ছিল এই একই কারণ—তাৎক্ষণিক ফলাফল কামনা। এই মানসিকতা এমনকি আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে। আমাদের অনেক লক্ষ্য আছে, স্বপ্ন আছে। কিন্তু একটু চ্যাট করি, একটু ফানি ভিডিও দেখি, একটু স্ন্যাকস খাই এসব থেকে আমরা যে তাৎক্ষণিক তৃপ্তি পেতে চাই, তা আমাদের এই স্বপ্ন আর লক্ষ্য পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণে আমরা দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হই।

এই মানসিকতা অনৈসলামি এবং ধ্বংসাত্মকও বটে। উম্মাহর বর্তমান অবস্থাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। একদিকে চরমপন্থিরা জান্নাতে যাওয়ার শর্টকাট খুঁজছে, অন্যদিকে সাধারণ মুসলিমরা নিজেদের প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কারণ, ধার্মিকতার পথটায় তাৎক্ষণিক তৃপ্তির অবকাশ নেই। এ পথে ধৈর্য ধরে এগোতে হবে, সাথে সাথে জীবনব্যাপী ধার্মিকতা অর্জনে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ইসলাম শিক্ষা দেয় সবরের। এর মধ্যে রয়েছে ধৈর্য, একাগ্রতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং ধারাবাহিকতা। এসবকিছুর জন্যই দরকার দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টা। এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য। সফলতার পথে যেকোনো শর্টকাটই এক ধরনের প্রতারণা। এটা অবাস্তব এবং ইসলামি আদর্শের বিপরীত।

এসব থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের চিন্তার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। বিশেষ করে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ পৃথিবীকে দেখি, সে দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, পার্থিব কিংবা পরকালীন সফলতা অর্জিত হবে দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানের কোনো শর্টকাট উপায় নেই, যেমন নেই আত্মিক প্রশিক্ষণ কিংবা অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্যেও। যেটা চান, সেটাতে মনে-প্রাণে লেগে থাকতে হবে, কাজ করে যেতে হবে।

পরের কোনো অধ্যায়ে সবরের ধারণা এবং টাইম ম্যানেজমেন্টে সবরের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। এ অংশের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের গড়িমসি করার পেছনের কারণগুলো বোঝার চেষ্টা করা। বদঅভ্যাসের কারণগুলো বুঝতে পারলেই এগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

আলসেমি যখন ভালো

আমার এতক্ষণ পর্যন্ত বলা কথা শুনে মনে হতে পারে আমি বোধহয় একটুও অলসতা করি না এবং আমি গড়িমসি করার চরম বিরোধী। আসলে তা না, আমিও গড়িমসি করি, অলসতা করি কিন্তু যখন সেটা লাভজনক। পরিকল্পনা করে, গুছিয়ে কোনো কাজে অলসতা করা ক্ষেত্রবিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল হয়ে উঠতে পারে। কোনো কাজ করার যথার্থ সময়টা আসার আগপর্যন্ত কাজটি না ধরাই হলো ভালো অলসতা।

যেমন ধরুন, আমি খুব ক্লান্ত এবং এখন অফিসে কাজের সময়ও শেষ। এ সময়টাতে আমি একটু বিশ্রাম করব, মজা করব এবং কালকের জন্য বাকি কাজ রেখে দেব। অফিস টাইমেই অবসন্নবোধ করলে তখনও উচিত ছোট একটি ব্রেক নেওয়া, একটু মজার কিছু করা। এরপর আবার পূর্ণোদ্যমে কাজে ফিরে যাওয়া।

হয়তো ভাবছেন, যে কাজ আজকে করা সম্ভব সেটা কেন আগামীকালের জন্য ফেলে রাখা? এর উত্তর হলো, 'কারণ আমি জানি আগামীকাল আমি কাজটি আজকের চাইতে আরও ভালোভাবে করতে পারব'।

যদি আপনার লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষাগুলো বড় হয় তা হলে সেগুলো পূরণ করা এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, এক বছর এমনকি দশ বছরেও সম্ভব না হতে পারে। আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে, কিছু কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগোতে হবে। এখানে কিছু কাজে একটু গড়িমসি করতে হবে, ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখতে হবে। যে কাজগুলো এখনই করতে হবে, সেগুলোতে যাতে সময় দেওয়া যায় এবং ভারী কাজগুলো অন্য সময়ে চাপ ছাড়া করা সম্ভব হয়।

কখনও এমন হয় যে, শীঘ্রই একটি কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হবে কিন্তু আপনার এখন প্রয়োজন ছুটি। এজন্য আপনি মোটেও মন খারাপ করবেন না। ছুটিটাই আপনার জন্য ভালো। কারণ, এতে আপনি রিচার্জড হয়ে যাবেন, শরীর ও মন উভয়ই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তখন আপনার পক্ষে আরও ভালো কাজ করা সম্ভব হবে। ছুটিটা না নিলে তা হতো না।

এ ধরনের procrastination ভালো। কারণ পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই এটা করা হচ্ছে। আর তাই কোনো রকম খারাপ লাগার অনুভূতি না রেখেই এটা করা উচিত। মোটা দাগে বিবেচনা করলে, যা থেকে ভবিষ্যতে উপকার পাওয়া যাবে, তা-ই ভালো, হোক না সেটা আলস্য বা গড়িমসি।

শুরু করে দিন

আপনার লক্ষ্য ঠিক আছে, আপনি জানেন গড়িমসি করা উচিত না, পরিকল্পনাও ঠিক করা আছে কিন্তু আপনি এখনও কাজটি শুরু করেননি। কিছু একটি আপনাকে আটকে রাখছে। নানা আশঙ্কা-অজুহাত আপনার মনে দানা বেঁধে আছে। এমন হলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বলুন দেরি করে কোনো লাভ নেই।

নষ্ট হওয়া একটি দিন ফিরে পাবেন না। কেন একে হেলায় হারাতে দিচ্ছেন? আজ থেকেই নিজের জীবনযাপনের ধরন বদলে ফেলুন, লক্ষ্যগুলো পূরণে স্থির থাকুন। এভাবে কি কোনো কিছু হারাবেন আপনি?

আজ থেকে দশ-বিশ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান, সেটা নিয়ে ভাবুন। সে অবস্থানে পৌঁছাতে চাইলে আপনাকে কিন্তু আজকে থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। দেরি করলে কোথাও পৌঁছাতে পারবেন না।

আপনার মনের ভেতরেই সবকিছু ঘটছে। কাজেই কোন বিষয়গুলোতে মন দেবেন এবং কোন ভাবনাগুলোর ওপর কাজ করবেন, এসব আপনার হাতেই। অজুহাতগুলো সরিয়ে দিন, নিজের ঘড়ির কাঁটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিন এবং বদলে যাওয়া শুরু করুন।

> "আগামীকালকে যে নিজের জীবনের অংশ হিসেবে দেখে সে আসলে মৃত্যুকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। সামনে কত দিন আসবে অথচ সে থাকবে না! ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কত স্বপ্ন অথচ অনেক স্বপ্নই তার পূরণ হবার নয়। জীবনের ব্যাপ্তি বা এর সময়কাল এবং কত দ্রুত এ সময় কেটে যায় এসব নিয়ে ভাবলে সব ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা স্বাদ হারিয়ে ফেলবে।" আউন ইবনু 'আবদুল্লাহ

নতুন অভ্যাস : নতুন শুরু

আদতে টাইম ম্যানেজমেন্ট হলো পুরোনো বদঅভ্যাসকে ভালো অভ্যাস দিয়ে বদলে ফেলা। প্রত্যেকেরই কিছু খারাপ অভ্যাস রয়েছে, যা সময় নষ্ট করে অথবা দেরির কারণ হয়। সাধারণ সমস্যা হিসেবে আমরা গড়িমসি করা নিয়ে আলোকপাত করেছি। কিন্তু এমন আরও অনেক আছে। যেমন, আলস্য, অতিরিক্ত ঘুম, অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া এবং অতিমাত্রায় সামাজিকতা পালন। বিচিত্র কারণে মূল ধারার বিদ্বান 'আলিমগণ এসবকে হৃদয়ের জন্য ক্ষতিকর বলেছেন।

এসব শুধু আমাদের সময়ই নষ্ট করে না বরং আত্মাকেও পেঁচিয়ে ফেলে। একইসাথে সম্পদ ও জ্ঞানের অপচয়ের দিকেও নিয়ে যায়। টাইম ম্যানেজমেন্টের সাথে লেগে থাকতে চাইলে সময়ের পরিক্রমায় অনেকগুলো বদঅভ্যাস বদলাতে হবে। একটি বদঅভ্যাস বদলানোর কিছু মৌলিক সূত্র আছে:

- বদঅভ্যাসটি চিহ্নিত করুন।
- যে ভালো অভ্যাসটি দিয়ে খারাপ অভ্যাসটিকে বদলাবেন সেটিও চিহ্নিত করুন।
- চিহ্নিত করা হয়ে গেলে আজ থেকে বদঅভ্যাসগুলো বদলে ফেলে ভালো অভ্যাসগুলোর চর্চা আরম্ভ করে দিন।
- নতুন অভ্যাসটি সত্যিকার অর্থে 'অভ্যাসে' পরিণত হওয়ার আগপর্যন্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করুন। (সাধারণত গড়ে ৩০ দিন)

* এরপর থেকে নতুন অভ্যাস গড়ে তোলার কাজটি সহজ হয়ে যায়। তখন আপনি নতুন অভ্যাস গড়ে তোলায় মনোযোগী হতে পারেন।

অভ্যাস বদলাতে হলে প্রয়োজন সবর এবং লেগে থাকার মানসিকতা। এতে আপনার কেবল উপকারই হবে। আর খারাপ অভ্যাস বদলিয়ে আপনি আসলে কিছুই হারাচ্ছেন না।

টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু মূল অভ্যাস রয়েছে, যেগুলো আপনার মাঝে গড়ে তুলতে হবে:

পরিকল্পনা

পরিকল্পনা করা ইতিহাসের প্রতিটা সফল ব্যক্তির জীবনধারার উপকরণ ছিল। দেখুন না, নবিজির হিজরাত কতটা সুপরিকল্পিত ছিল! খালিদ ইবনু ওয়ালিদ যুদ্ধের জন্য তার সৈন্যদের কত বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে সাজিয়েছিলেন। এবং ইসলামের ইতিহাস জুড়ে লেখা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর পেছনে কত পরিকল্পনার ছাপ ছিল!

যথেষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া বড়সড় কিছু করা সম্ভব নয়। আর তাই পরিকল্পনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা হতে পারে একটি লক্ষ্য পূরণে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা তৈরি করা অথবা প্রতিটা দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, লেকচার, মিটিং কিংবা একটি ক্লাসের জন্য পরিকল্পনার ছক সাজানো। দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় এ অভ্যাসটি সময়ের সদ্ব্যবহারে এবং জীবনের সেরাটুকু দিতে আমাদের সাহায্য করে।

ভেঙে ভেঙে কাজ করা

গড়িমসি করার পেছনে খুব বড় একটি কারণ হলো—সামনে থাকা কাজগুলোকে এক বিশাল স্তূপাকারে দেখা। কিন্তু যেকোনো পাহাড়সম কাজকে ভেঙে চড়ার মতো উপযোগী করা যায়। এজন্যেও দরকার যথাযথ পরিকল্পনা, সাথে ধারাবাহিক অল্পস্বল্প প্রচেষ্টা। কিন্তু এ অভ্যাস প্রচুর সময় বাঁচায়।

একটি উদাহরণ দিই: ধরুন, আপনি একজন স্কুলশিক্ষক। একটি পরীক্ষার জন্য আপনাকে ১০০টা প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। আপনার হাতে সময় আছে ১০ দিন। অধিকাংশ মানুষই এ ১০ দিনের কিছু দিন পার করে 'এত কম সময় কেন' বলে অভিযোগ করে। আর কিছুদিন পার করে 'আয় হায়! সময় তো শেষের দিকে' ভেবে দুশ্চিন্তা করে। আর অবশেষে নির্ধারিত সময়ের আগের রাতে তাড়াহুড়ো করে প্রশ্ন তৈরি করতে বসে। এ ধরনের পদ্ধতি অর্থহীন, অবান্তর।

প্রতিদিন ১০টা করে প্রশ্ন তৈরি করা যায় না? এতে সময়ও কম লাগবে, চাপও কম হবে, নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে আবার প্রশ্নগুলোও বেশ মানসম্মত হবে।

এ ধারণা আমাদের জীবনের সবক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসাইনমেন্ট করবেন? একেবারে না করে ভেঙে ভেঙে করুন। একদিন গবেষণা করুন, আরেকদিন তথ্য সংগ্রহ করুন, আরেকদিন এসাইনমেন্টের রূপরেখা প্রস্তুত করুন। শেষে কিছুদিন লেখালেখিতে হাত দিন। দেখবেন কোনো রকম চাপ ছাড়াই আপনার এসাইনমেন্ট শেষ হয়ে যাবে।

আমি বই লেখার ক্ষেত্রে এ কৌশলটাই ব্যবহার করি—ভেঙে ভেঙে কাজ করা। প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখি লেখালেখির জন্য। এই এক ঘণ্টায় আমি ৫-৬ পৃষ্ঠা লিখি আর এভাবে কয়েক মাসের ভেতরে একটি পুরো বই লেখা শেষ করি। ভেঙে ভেঙে কাজের অভ্যাস করাটা খুবই কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য পূরণে খুব প্রয়োজনীয়।

রাসূলুল্লাহ আমাদের অল্প পরিমাণে হলেও নিয়মিত নাফ্‌ল "ইবাদাত করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

> " নেক আমল করো যথাযথভাবে, নিষ্ঠার সাথে এবং পরিমিত পরিমাণে। জেনে রাখো, তোমাদের আমল তোমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে না। আর আল্লাহর কাছে সবচে প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে করা হয়। এমনকি তা পরিমাণে কম হলেও।" (সহীহ বুখারী)

সময় বরাদ্দ করা

গড়িমসি করা এবং ঠিকভাবে লক্ষ্য পূরণ করতে না পারার অন্যতম কারণ হলো লক্ষ্যের জন্য সময় বরাদ্দ না রাখা। জীবনের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য সময় বরাদ্দ রাখা খুব ভালো একটি অভ্যাস।

ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, আমি আমার স্ত্রী, বাচ্চা, লেখালেখি, পড়াশোনা, কুরআন তিলাওয়াত, বাচ্চাদের হোম-স্কুলিং করানো এবং কাজের প্রতিটা ক্ষেত্রের জন্য সময় ভাগ করে রাখি। এভাবে সময় নির্দিষ্ট করে রাখার কারণেই আমার পক্ষে সব কাজ সুন্দরভাবে শেষ করা সম্ভব হয়।

এই অভ্যাসটা গড়ে তোলা খুব সহজ। প্রতিটা লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা ঠিক করার সময়ই কোন কাজের জন্য কতটুকু সময় দরকার তা নির্ধারণ করে ফেলুন। দেখুন ওই কাজটির জন্য কোন সময়টা যথার্থ এবং সে সময়টাই ঠিক করুন।

একাগ্র হওয়া

একাগ্র হওয়া একটি অভ্যাস এবং গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসই বটে। পূর্বের এবং বর্তমান সময়ের সফল মানুষদের জীবন থেকে দেখা গেছে—তাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল এই মুহূর্তের কাজটিতে একাগ্র থাকতে পারা। একাগ্রতা মানে হাতের সামনের কাজটির প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকা এবং নিজেকে বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়া।

এই অভ্যাস গড়ে তুলতে কিছু শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। জীবনযাপনে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময়-ব্যবহার সংকুচিত করা। একাগ্রতার সাথে কাজ করলে যে কাজ ত্রিশ মিনিটে শেষ হয়ে যাবে, বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে করলে সে জায়গায় সময় লাগবে দুঘণ্টা।

আমাদের ধর্মের একটি সুন্দর দিক হলো সালাতের মাধ্যমে একাগ্রতার বেশ ভালো প্রশিক্ষণ পাওয়া। যদিও অনেকে ভালোভাবে সালাত পড়ি না বলে এ উপকারটুকু পাই না। অনেকের জন্য সালাত একটি আনুষ্ঠানিকতার বিষয়, হৃদয় এবং আত্মার কোনো সংযোগ এতে থাকে না। একাগ্রতা গড়ে তোলার জন্য সালাত হলো সবচে উত্তম পন্থা। সালাত থেকে প্রাপ্ত এ প্রশিক্ষণ এরপর জীবনের অন্যসব ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাবে।

অনুসূচির সাথে লেগে থাকা

অনেককে দেখেছি একটি শিডিউল (অনুসূচি) বা টু-ডু লিস্ট তৈরি করেছেন কিন্তু সেটা মেনে চলেননি। কিছুদিন পর হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এরপরও কিন্তু সময় কম নিয়ে তাদের অভিযোগ করা থামে না। রুটিন মেনে চলা একটি অভ্যাসের মতো, আর কোনো অভ্যাস গড়ে তুলতে লেগে থাকা খুব জরুরি। আর এই লেগে থাকাটা ততক্ষণ পর্যন্ত হতে হবে যতক্ষণ না তা আপনার জীবনযাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে যাচ্ছে।

শিডিউল মেনে চলার অভ্যাসটি আমাদের সুন্দরভাবে সময় ব্যাহারে সাহায্য করবে।

যা যা করব

জীবনে কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে গড়িমসি বা আলস্য করছেন চিহ্নিত করুন। কোনো একদিন অবশ্যই করবেন এই ভেবে আর করা হয়নি, এমন জিনিসগুলোর একটি লিস্ট তৈরি করুন। হতে পারে কোনো একটি জায়গায় ঘুরতে যেতে চেয়েছেন, একটি বই লিখতে চেয়েছেন অথবা একটি চাকরিতে এপ্লাই করতে চেয়েছেন। যাই হোক না কেন, লিস্টে যোগ করুন।

এবার এই জিনিসগুলোতে গড়িমসি করার ভালো ও খারাপ দিকগুলোর একটি লিস্ট করুন। লিস্টের প্রতিটা আইটেমের জন্য দুইটি কলাম থাকবে। একটিতে লিখুন ওই বিষয়টিতে আলস্য করার ভালো দিকগুলো, আরেকটিতে লিখুন খারাপ দিকগুলো। হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গড়িমসি করাটাই ভালো। যেমন, গাড়ি কিনতে চাইলে লোন নিয়ে এখন কেনার চেয়ে পরে ক্যাশে কেনা ভালো। তবে গড়িমসির কলামে কম আইটেম থাকবে। সাধারণত গড়িমসির ফলে বেশির ভাগ কাজেই ক্ষতি হয় এবং কোনো এক সময় লক্ষ্যটা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। এ ধরনের লিস্ট সামনে থাকার ভালো দিক হলো আপনি উপলব্ধি করবেন যে, অযথা বিলম্ব করে লাভ নেই, দ্রুত কাজে নেমে পড়তে হবে। কারণ, ক্ষতিকর দিক যদি উপকারী দিকের চেয়ে ভারী হয়, তা হলে গড়িমসি করার কোনো মানেই হয় না।

কোন কাজ কীভাবে, কখন, কোথায় করবেন এসবের একটি কর্মপরিকল্পনা সাজান। এরপর সে অনুযায়ী কাজ করুন। এক্ষেত্রে S.M.A.R.T গোল পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারেন। ধরুন, আপনি কোনো একটি জায়গা ভ্রমণে যাবেন। এখন আপনার কাজ হবে ওই জায়গায় যেতে আপনার কেমন খরচ হতে পারে তার হিসেব ঠিক করা, ওই পরিমাণ টাকা জমাতে কত দিন লাগবে তা ঠিক করা। এরপর টাকা জমানোর এবং ভ্রমণের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা। যত সুনির্দিষ্টভাবে এটা করা যায় তত ভালো। নির্ধারিত সময়সীমার ব্যাপারে সচেতন হোন, ডেডলাইন পার হয়ে যেতে দেবেন না। এটুকু আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে এবং গড়িমসি করা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করবে।

আপনার লক্ষ্য পূরণের ক্ষণটা কল্পনা করুন, যতটা বাস্তবতা আনা যায়, ততটা বাস্তবতা আনুন আপনার কল্পনায়। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কখনও কখনও আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটা খুব দীর্ঘ এবং কষ্টকর মনে হয়। ফলে আমরা এক সময় হাল ছেড়ে দিই এবং বর্তমানে যেখানে আছি সেখানেই রয়ে যাই। এরকম সময়গুলোতে কল্পনা করা খুব কাজে আসে। আপনার স্বপ্নগুলো পূরণ হয়েছে, আপনার লক্ষ্যগুলো পূরণে আপনার জীবন কীভাবে আরও গোছানো হয়ে গেছে—এসব কল্পনা করুন। যত সূক্ষ্মভাবে পারা যায় তত সূক্ষ্মভাবে। যত পরিষ্কারভাবে আপনার স্বপ্ন পূরণের ক্ষণটা কল্পনা করতে পারবেন, সে স্বপ্ন পূরণের পেছনে ছুটতে তত বেশি অনুপ্রাণিত হবেন। কুরআনে জান্নাতের অনেক বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আমরাও জান্নাতের দৃশ্য কল্পনা করি আমাদের মতো করে। জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা এবং সে আকাঙ্ক্ষা ঘিরে কল্পনা আমাদের অনুপ্রাণিত করে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে। একই কাজ তাই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন, আমার যখন এই বই লেখার কথা মাথায় এলো, তখন থেকেই আমি কল্পনা করা শুরু করে দিয়েছিলাম বইটি দেখতে কেমন হবে। আমি বইটি কল্পনায় আমার

বুকশেলফে দেখতে পাচ্ছিলাম। কল্পনা করছিলাম আমি বইটির প্রচ্ছদ দেখছি, একের পর এক বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি। আমার বইটি বেস্টসেলার হয়েছে, বইটির কপি আমার পরিবার এবং বন্ধুদের গিফট করছি—এমনও কল্পনা করেছি। এ ভাবনাগুলো আমাকে বইটি লেখার কাজে এগিয়ে যেতে ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এটাই হলো কল্পনা করতে পারার ক্ষমতা। এরপর কখনও যদি অনুপ্রেরণা খুঁজে না পান তবে কল্পনা করে দেখুন, কী হয়!

পঞ্চম ধাপ: গতিবেগ ধরে রাখা

বদঅভ্যাসের ফাঁদ

টাইম ম্যানেজমেন্ট মূলত নতুন নতুন অভ্যাস গড়ে তোলা। শুরুতে সবচে কঠিন হলো অভ্যাসগুলো ধরে রাখা, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেগুলো স্বভাবে পরিণত হয়। ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ বদঅভ্যাস গড়ে ওঠার পরিক্রমা নিয়ে চমৎকার একটি বিশ্লেষণ করেছেন:

"নেতিবাচক এবং মন্দ ভাবনাগুলোর বিরুদ্ধে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ান। কারণ, এতে ব্যর্থ হলে সে ভাবনাগুলো ধারণায় রূপ নেবে। সে ধারণাগুলো রুখে না দিলে আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হবে। তাই রুখে দিন, প্রতিরোধ করুন।

যদি রুখে না দাঁড়ান, তা হলে এগুলো সংকল্প হয়ে দাঁড়াবে। যদি প্রতিরোধ না করেন তা হলে একসময় কাজটি ঘটিয়ে ফেলবেন। আর যদি এর বিপরীতে ভালো কিছু না করেন তা হলে এমন বদঅভ্যাস গড়ে উঠবে, যা পরিত্যাগ করা হবে খুব কঠিন।

বদঅভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন তবে অসম্ভব না। মূল কথা হলো বদঅভ্যাসগুলো কেন ছাড়তে চাই, সে ব্যাপারটা জানা থাকা এবং ভালো অভ্যাস দিয়ে বদঅভ্যাসকে বদলে দেওয়া। টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এর মানে হলো, গড়িমসি করার অভ্যাসকে পরিকল্পনা, ভেঙে ভেঙে কাজ করা এবং আগে থেকে কাজ এগিয়ে রাখার অভ্যাস দিয়ে বদলে দেওয়া।

তবু দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছাড়া মোমেন্টাম ধরে রাখা খুব কঠিন। তাই এ ব্যাপারে সচেতন থাকাটা খুব জরুরি, যাতে বদঅভ্যাসে পুনরায় জড়িয়ে না যাই।

কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে বদঅভ্যাসে জড়িয়ে পড়া থেকে আমরা বাঁচতে পারি:

ডেইলি রিমাইন্ডার সেট করা

এমন কিছু থাকতে হবে, যা আপনাকে প্রতিদিন আপনার কাজগুলোর কথা মনে করিয়ে দেবে। অফিসের দেয়ালে পোস্টার হিসেবে অথবা পিসির ব্যাকগ্রাউন্ডে টু-ডু লিস্ট রাখতে পারেন। পোস্ট-ইট নোট ব্যবহার করে যেখানে যখন রিমাইন্ডার দরকার আঠা দিয়ে সেটে দিতে পারেন। PDA ব্যবহার করতে পারেন অথবা এলার্ম সেট করতে পারেন। কাজগুলোর কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন কোনো অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন।

ট্র্যাকে থাকার জন্য বর্তমানে যথেষ্ট ভালো ভালো পদ্ধতি আছে। একটু খোঁজাখুঁজি এবং সৃজনশীলতা ব্যবহার করে আপনার উপযোগী পদ্ধতিটি খুব সহজেই খুঁজে পেতে পারেন। মূল কথা হলো যখন যেখানে দরকার সেখানে সে সময়ে যেন ঠিকঠাক রিমাইন্ডার পান।

পরিবার এবং বন্ধুদের মনে করিয়ে দিতে বলুন

এ ধাপটা দু-ধারি তলোয়ারের মতো। আপনার আশেপাশের মানুষেরা যদি নিজেরাই অগোছালো হন, তা হলে তাদের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে তেমন কোনো উপকারই পাবেন না। কারণ তাদের নিজেদেরই মনে থাকবে না।

কিন্তু আপনার জীবনকে গুছিয়ে দিতে ভূমিকা রাখতে পারে, এমন পরিবারের সদস্য বা বন্ধু খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে আপনার জন্য। বিশেষ করে আপনার শুরুর দিনগুলোতে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। পরিবারের সে সদস্যটি কিংবা বন্ধুটি ফোন করে অথবা মেসেজ দিয়ে আপনাকে মনে করিয়ে দিতে পারে।

সাধারণত অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেকে এসব ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তোলা উচিত। কিন্তু আপনি যদি এখনও প্রস্তুত না হোন, তবে এ পদ্ধতিটি আপনার জন্য খুবই কার্যকর। অন্ততপক্ষে যতক্ষণ না এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে।

আপনার কাজ এবং পছন্দগুলো যাচাই করুন

মানুষকে আল্লাহ এমন একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যেটা আর কোনো প্রাণীর নেই। সেটা হলো নিজের ভাবনাগুলো নিয়ে চিন্তা এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। কাজ করার আগে চিন্তাভাবনা করে এ দক্ষতাটা আমরা কাজে লাগাতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ: ধরুন, আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি রিপোর্ট লিখবেন, যাতে সময় লাগবে এক ঘণ্টা। কিন্তু হঠাৎ একটি ফেসবুক নোটিফিকেশন এসে আপনাকে ৩

মিনিটের একটি ফানি ভিডিও দেখতে বলল। এই ভিডিওটা আপনি দেখলেন, দেখা শেষে আরেকটা ৫ মিনিটের ভিডিওর লিংক এল। সেটাও দেখলেন এবং এভাবে টানা এক ঘণ্টা ধরে আপনি একের পর এক ভিডিও দেখতেই থাকবেন, যদি নিজেকে না আটকান। নিজেকে তখন এই প্রশ্নগুলো করবেন, 'কী করছি আমি'? 'এটা কি প্রোডাক্টিভ'? 'এ কাজে কি সময় নষ্ট হচ্ছে'?

এসব সময় নষ্টের কাজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো এত সহজে হয়ে ওঠে না। মনকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। এর আগপর্যন্ত 'কী করছি', সে ব্যাপারে নিজেকে সচেতন থাকতে হয়। পথ থেকে সরে যাচ্ছি টের পেলেও নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হবে। এজন্য নিজের সাথে সততা বজায় রাখতে হবে এবং নিজের প্রতিটা সিদ্ধান্তকে যাচাই করে নিতে হবে।

বার্নআউট সামলানো

কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে একই দিনে অনেকগুলো কাজ করে ফেলতে চান। এতে করে তারা নিজেদের ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন। আর শেষপর্যন্ত এ অতিরিক্ত বোঝা মোড় নেয় বার্নআউটে। বার্নআউট হলো খুব বেশি কাজ করে ফেলার ফলে তৈরি হওয়া অতিরিক্ত ক্লান্তিকর অনুভূতি। এর ফলে আরও কাজ করতে যাওয়ার ব্যাপারে সমস্ত আগ্রহ চলে যায়। বার্নআউট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আসতে পারে।

বার্নআউট এড়ানোর সবচে ভালো উপায় হলো সাধ্যের চেয়ে অতিরিক্ত কাজের বোঝা কাঁধে না নেওয়া। এজন্য নিজের লক্ষ্য এবং সীমাবদ্ধতাগুলো জানা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। দরকারি ও সাধ্যের মধ্যকার কাজগুলোই হাতে নেওয়া উচিত। এই বিষয়টা আমি বেশ কাঠখড় পুড়িয়েই শিখেছি।

২০১১-এর দিকে অনেকগুলো কাজ একইসঙ্গে করছিলাম। ৬-৮ ঘণ্টা ধরে এরাবিক ক্লাস নিচ্ছি, বই লিখছি, ৮ ঘণ্টার ফুলটাইম চাকরি করছি সপ্তাহে ৬ দিন, একইসাথে চলছে BAIS-এ পড়াশোনা। ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিচ্ছি, ১০ ঘণ্টা প্রতি সপ্তাহে অনলাইন ক্লাসও নিচ্ছি। এসবের পর পরিবারকেও সময় দিয়েছি। কাজের অতিরিক্ত চাপে আমি তখন বেশ মেজাজি এবং গম্ভীর হয়ে পড়লাম। কারণ, আমি আমার শরীর এবং মস্তিষ্কের সাধ্যের চেয়ে বেশি বোঝা নিয়ে ফেলেছিলাম। আবার নিজে যথাযথ সময় না দেওয়ায় সবকিছুর মাঝে ভারসাম্যও রক্ষা করতে পারছিলাম না।

এই অবস্থায় কিছু কিছু কাজ থেকে আমার অব্যাহতি নেওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়াল। এরাবিক ক্লাস নেওয়া ছেড়ে দিলাম এবং বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিতে

যাওয়া কমিয়ে দিলাম, যাতে নিজেকে এবং পরিবারকে আরও বেশি সময় দিতে পারি। এতে করে আমার মাসিক আয় কমে গেলেও মানসিক প্রশান্তি এবং সুখ টাকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক প্রশান্তি থাকলে ভবিষ্যতে আরও আয় করা সম্ভব হবে এবং কাজও আরও মানসম্মত হবে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, প্রাত্যহিক রুটিনে যেন বিশ্রাম এবং বিনোদনের জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ থাকে। অনেকেই এসবকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে বিবেচনা করেন না। তারা এগুলোকে সময়ের অপচয় ভাবেন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের কিছু চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এসব চাহিদার মাঝে আছে বিনোদন এবং বিশ্রাম। এসব এড়িয়ে গেলে আমরাও বার্নআউটের স্বীকার হব। কারণ, মানবমস্তিষ্ক বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করার আগপর্যন্তই কাজ করতে পারে। এরপর আর পারে না।

তাই নিজের ওপর দয়া করুন এবং যখনই দরকার হয় তখনই বিশ্রাম নিন। প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিটের একটি বিশ্রাম নিন, প্রতি সন্ধ্যায় নিজেকে এক ঘণ্টা সময় দিন। আর সপ্তাহে একটি দিন শুধু আরাম করবেন, এদিন কাজ নিয়ে কিছুই ভাববেন না।

প্রতি বছর একবার ঘুরতে যান। আল্লাহর এই সুন্দর পৃথিবীটা ঘুরে আসুন। এখানে মূল কথা হলো একটি ব্রেক নেওয়া এবং মনকে বিশ্রাম দেওয়া। কাজের সময়ে কিংবা পারিবারিক দায়িত্ব পালনের সময়ে এটা সম্ভব না। এজন্য দরকার নির্জন একান্ত সময়। আর নিজের জন্য এমন সময় নেওয়াতে মোটেও দোষের কিছু নেই।

অধিকাংশ চাকরিতেই সপ্তাহে এক বা দুদিন ছুটি থাকে। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের কাজের চাপের দুশ্চিন্তায় অনেকে এ ছুটির দিনগুলোও উপভোগ করতে পারেন না। সমাধান সে আগেরটাই—হাতের কাজে মন দিন। এক্ষেত্রে হাতের কাজটি হলো আরাম করা, বিশ্রাম নেওয়া। আরাম করার সময় মনকে দুশ্চিন্তা করার সুযোগ দেবেন না। সুখের এবং আনন্দময় জিনিস নিয়ে ভাবুন, মুহূর্তটা উপভোগ করুন। বিশ্রামের সময়টায় যা করছেন, তা আনন্দের সাথে করুন। তা হলে আগামীকালের কাজ করতে আরও বেশি অনুপ্রেরণা পাবেন।

করে দেখুন, সত্যি ভীষণ উপকার পাবেন। পাঁচ মিনিটের হলেও ব্রেক নিন। সজীব অনুভূতি আবারও আপনার ভেতরটাকে উজ্জীবিত করে তুলবে।

বার্নআউট এড়াতে আমার সর্বশেষ উপদেশ হলো অযথা কাজ এবং মানসিক চাপকে 'না' বলুন। অন্যকে 'না' বলতে, তাদের অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে অনেকেই বিব্রতবোধ করেন। তারা ভাবেন সবার কাজ করে দেওয়া তাদের যেন অবশ্য কর্তব্য।

এ ধরনের স্বভাব অবাস্তব এবং আনপ্রোডাক্টিভ, ইসলাম আপনাকে এসব করতে বাধ্য করে না। ভদ্রভাবে 'না' বলা শিখুন, তখন মানুষও বুঝতে পারবে যে আপনি ব্যস্ত এবং তারা বিষয়টা ধীরে ধীরে মেনে নেবে।

এখানে মূল কথা হলো ভদ্রতা সহকারে কিন্তু স্পষ্টভাবে 'না' বলা এবং মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তারা যেন এটাকে ব্যক্তিগতভাবে না নেয়। অধিকাংশ মানুষই ব্যাপারটা বুঝবে, কেউ কেউ না বুঝলে তার জন্য আপনি দায়ী নন। কারণ, আপনি আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।

সবর থাকা

গতিবেগ ধরে রাখার মানে সামনের সব বাধা ঠেলে নিজেকে এগিয়ে নিতে থাকা। এটাকেই আরবিতে সবর বলা হয়। একজন বিশ্বাসীর চরিত্রে এটা অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যার উল্লেখ কুরআনে অসংখ্যবার হয়েছে। সবরের অনুবাদ সাধারণত করা হয় ধৈর্য। কিন্তু সবর মানে শুধু ধৈর্য নয়, বরং এর সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িত। ধৈর্য ছাড়াও অধ্যবসায়, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং ধারাবাহিকতাও এর অর্থের মধ্যে পড়ে। এ প্রত্যেকটা বিষয়ই টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ধৈর্য

নিজের স্বপ্ন এবং লক্ষ্যগুলো পূরণ করা অল্প সময়ের প্রজেক্ট না। এজন্য প্রয়োজন সারা জীবন সুন্দরভাবে একটি ভালো জীবনব্যবস্থার প্রতি কমিটেড থাকা। আবার এজন্য দরকার প্রচুর ধৈর্য। অনেক বড় স্বপ্ন ও লক্ষ্যগুলো রাতারাতি পূরণ করা সম্ভব নয়।

আপনাকে সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফলের কথাও মাথায় রাখতে হবে। এটা করার একটি অন্যতম উপায় হলো লক্ষ্যগুলোকে কল্পনার চোখে দেখা। এমনভাবে দেখা যেন তা একেবারে চোখের সামনেই, যেন তা সত্যিই ঘটছে। ধরুন, আপনি স্বপ্ন দেখেন ছোট একটি দ্বীপের মাঝে একটি সুন্দর বাড়ির। এখন দ্বীপের সে বাড়িটি নিয়ে এমনভাবে ভাবুন আর কল্পনা করুন, যাতে প্রতিদিন সে স্বপ্ন পূরণের জন্য ছুটতে অনুপ্রেরণা খুঁজে পান। যদিও সে স্বপ্ন পূরণ হতে ৫-১০ বছর লেগে যায়।

আমরা মুসলিমরা জান্নাত নিয়ে সারা জীবন এই কাজটিই করি। আমরা জান্নাতের দৃশ্য কল্পনা করি, ভাবি সেখানে আমাদের ঘরটা দেখতে কেমন হবে, কীভাবে জান্নাতে গেলে আমাদের সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে। এতে করে আমরা গুনাহ থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত হই। আর এটা আমরা গোটা জীবন ধরেই করি।

জান্নাত পেতে যে ধৈর্য দরকার, এটা তারই অংশ। আর এই কাজটি আমরা পার্থিব কাজের ক্ষেত্রেও করতে পারি।

অধ্যবসায়

লক্ষ্য পূরণের পথে অনেক বাধা-বিপত্তি আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে। এটাই জগতের নিয়ম। তাই সুখে থাকতে হলে এটা মেনে নিয়েই পথ চলতে হবে। দুনিয়ার জগৎ নিখুঁত না, এটা পরীক্ষার জায়গা। আর তাই আমরা বিভিন্নভাবে এখানে পরীক্ষিত হব।

এখানে মূল কথা হলো প্রস্তুত থাকা। লক্ষ্য অর্জনের পথে যেকোনো বাধা মোকাবিলা করার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখুন। যেকোনো বাধাকে ইতিবাচকভাবে দেখুন। যে বাধাই আসুক না কেন, সামনে এগিয়ে যান। সব পরিস্থিতিতে শান্ত থাকুন, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করুন। সব বাধা সরে যাবে।

প্রতিটা লক্ষ্য পূরণের পথেই বাধা আসবে। বাধাহীন কোনো লক্ষ্যই আসলে অতটা মূল্যবান নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাই ধরুন। তিনি বহু বছর ধরে দেশের সাধারণ মানুষের সমঅধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের জন্য কাজ করেছেন। আর শেষ পর্যন্ত তিনি সে কাঙ্ক্ষিত বাধার মুখোমুখি হন—কারাগার।

তবু তিনি তার লক্ষ্য পূরণে লেগে ছিলেন। ২৭ বছর কারাবন্দি থেকেও হাল ছাড়েননি। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসের সাথে তার এই অপ্রতিরোধ্য মানসিকতা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

আপনার লক্ষ্যগুলো ম্যান্ডেলার লক্ষ্যের মতো অতটা মহত্ত্বর নাও হতে পারে। কিন্তু মূলনীতি একই। যদি লক্ষ্যটা বলার মতো কিছু একটি হয়, যদি এমন কিছু হয় যার জন্য লড়াই করাটা সার্থক, তবে কোনো পিছুটানই আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সবরের আরেকটা অনুবাদ। সাধারণভাবে এর অর্থ গুনাহ করতে চাওয়ার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা। টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্যেও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ খুব প্রয়োজনীয়। এটা আমাদের সবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে থাকা উচিত। আমাদের সবারই কখনও না কখনও অযথা সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করে, এমন কিছু করার ইচ্ছে জাগে, যা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আমরা হয়তো খুব আফসোস করব। সে সময়গুলোতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের

গুণ থাকা খুব জরুরি। আমাদের মন্দ চাওয়াগুলোকে সাধ্যমতো দমন করে লক্ষ্যের প্রতি সজাগ থাকা উচিত।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ আত্ম-বিশ্বাসের জন্যেও খুব ভালো। আপনার প্রবৃত্তি, ভাবনা এবং কাজগুলো যত আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তত বেশি আপনি আত্ম-বিশ্বাসী অনুভব করবেন। এটি আবার আপনার প্রোডাক্টিভিটিও বাড়িয়ে দেবে। টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব মানে আছে। প্রয়োজনীয় কাজ করার সময় মোবাইল এবং ফেসবুক ব্যবহার বন্ধ রাখাও এর মাঝে পড়ে। যখন অলসতা করবেন তখনও নিজেকে একটু জোর দিন, কাজ করুন। আবার কাজের দিনগুলোতে ইউটিউব আর কমেডি ওয়েবসাইটে সময় নষ্ট করার তীব্র ইচ্ছেটাকেও রোধ করুন।

ধারাবাহিকতা

সবর ধারাবাহিকতার অর্থও বহন করে। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা টাইম ম্যানেজমেন্টের মৌলিকতম একটি বিষয়। শিডিউল তৈরি করেও যদি সে অনুযায়ী কাজ না করেন, তা হলে লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে। একটি শিডিউল বা টু-ডু লিস্ট মেনে চলা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এজন্যে দরকার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

যেকোনো কাজ হোক দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ব্যাপী, উভয় ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। এ ধরনের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিদিন ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া সফলতার ভিন্ন কোনো পথ নেই। কিন্তু এ পদক্ষেপগুলোকে হতে হবে সুপরিকল্পিত এবং প্রয়োগ করতে হবে ধারাবাহিকভাবে।

ইবনু জাওযী ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে একজন ভালো উদাহরণ। সারা জীবনে তিনি এক হাজারেরও বেশি বই লিখেছেন। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং কঠোরভাবে সময় মেনে চলার কারণে। ইমাম যাহাবী আবদুল লাতিফের সূত্রে বলেছেন, "ইবনু জাওযী একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট করেননি। তিনি দিনে চারবার রেজিস্ট্রি করতেন। তবু তার সংকলন, শিক্ষকতা এবং ফাতওয়া দেওয়ার কাজও অব্যাহত ছিল। এটা আসলে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিনের লক্ষ্য পূরণ করে যাওয়ার সুফল।"

সারাংশ

সাফল্যের পথে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য। মূল কথা হলো লক্ষ্যে অবিচল থাকা, পরিকল্পনা এবং বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সবরের চারটা গুণ ব্যবহার করে কাজে নেমে পড়া। এটুকু করুন, এরপর দেখবেন, আল্লাহর সহায়তা থাকলে আপনি অনেক বড় বড় কাজও করে ফেলতে পারছেন।

যা যা করব

আবারও যাতে পুরোনো বদঅভ্যাসগুলোতে জড়িয়ে না পড়েন, সেজন্যে একটি পদ্ধতি তৈরি করুন। হয়তোবা এই পদ্ধতি বেশ কয়েকবার সংশোধন-পরিমার্জন করতে হবে। তবু এটা গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি পদ্ধতি বের করুন, যা আপনার ক্ষেত্রে কাজ করে। এলার্ম ক্লক, নোটিফিকেশন, ডায়েরি লেখা, কোনো বন্ধুকে রিমাইন্ডার দিতে বলা—এরকম অনেক কিছু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আপনার উপযোগী একটি পদ্ধতি পেয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত পরীক্ষা চালাতে থাকুন। এরপর ওই পদ্ধতির সাথে লেগে থাকুন। গতিবেগ ধরে রাখতে সেটা ব্যবহার করুন, এমনকি প্রচণ্ড আলস্যের সময়ও। প্রতি বছরই নতুন নতুন অ্যাপ আর গ্যাজেট বের হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে। সেগুলোর খোঁজখবর রাখুন। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট সিরিজের ফ্যাবলেটগুলো খুব পছন্দ করি। এগুলোতে অনেক প্ল্যানিং টুল আছে, যা অন্য ফোনগুলোতে পাওয়া যায় না। আপনার নিজের জন্য একটি গবেষণা করুন, দেখুন কোনটা কাজে দেয়।

আপনার প্রিয় কিছু উদ্ধৃতি বেছে নিন। এমন উদ্ধৃতি, যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করে। এরপর এমন কোথাও রাখুন, যাতে সহজে আপনার চোখে পড়ে।

এ বইটি লেখার সময় আমার পিসির ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে একটি নোট রেখেছিলাম। সেখানে লেখা ছিল, আমি যদি প্রতিদিন কয়েক পৃষ্ঠা করে লিখি, তা হলে প্রতি মাসে আমি বই প্রকাশ করতে পারব। এ লেখাটাই আমাকে লিখে যেতে উৎসাহিত করে, এমনকি আমার অলস দিনগুলোতেও।

এই উদ্ধৃতি হতে পারে ধর্মীয় কিছু অথবা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তি কিংবা আপনার নিজের কোনো কথা। এ ধরনের কোট খুঁজে বের করুন এবং আপনার চোখে পড়ার মতো কোথাও রাখুন। যাতে অপচয়ে কেটে যাওয়া দিনগুলোতেও আপনি অনুপ্রেরণা পান।

আপনার লক্ষ্যগুলো কী এবং কেন সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তার একটি রিমাইন্ডার আপনার আশপাশে এমন কোনো জায়গায় রাখুন, যাতে সব সময় চোখে পড়ে।

আপনার লক্ষ্যগুলো কী কী, সেগুলো পূরণ হবার কতটা কাছে বা দূরে আছেন সেটা বের করার পদ্ধতি, এসব নিয়ে একটি ডায়েরি থাকা ভালো। বইও হতে পারে আবার পিসির কোনো ফাইলও হতে পারে। এই লিস্টের পাশাপাশি বিকল্প পরিকল্পনার লিস্টও সাথে রাখুন। কারণ প্রথম পরিকল্পনা খুব কমই কাজে আসে। ভুলগুলোর ব্যাপারে আগে থেকেই সচেতন হয়ে সেভাবে পরিকল্পনা করা দরকার। তাই প্রতিটা পরিকল্পনার বিকল্প হিসেবে প্ল্যান বি, সি, ডি রাখা উচিত।

লক্ষ্যগুলোকে এভাবে ট্র্যাক করার ফলে আপনার মাঝে প্রবল একটি উৎসাহ গড়ে উঠবে কাজে নেমে পড়ার জন্য। কারণ, এমন দিন আসতে পারে, যখন আপনার মনে হবে এসব লক্ষ্য পূরণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব না। তখন বই বা পিসির ফাইলটা খুলুন। প্রতিটি পয়েন্ট দেখুন। বুঝতে পারবেন যে, সফলতার পথে আপনার ভাবনার চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে আছেন। এ উপলব্ধিটা আপনাকে আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে।

ষষ্ঠ ধাপ: এড়িয়ে চলবেন যাদের

> "সময় দামি এক সম্পদ। একে তাই ধার্মিকতার কাজে লাগানো উচিত। আমি যথাসম্ভব লোকজনের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলি কিন্তু একেবারে এড়িয়ে যাওয়া তো আর সম্ভব না। তাই কেউ আমার সাথে কথা বলতে এলে কথোপকথন যথাসম্ভব সংক্ষেপ করার চেষ্টা করি। একই সময়ে আমার লেখালেখির জিনিসগুলো ঠিক করে রাখি। ছোটখাটো যেসব কাজ না করলেই নয় আবার যেগুলো কথা বলতে বলতেই করে ফেলা যায়, সেগুলোও করে ফেলি। এই কাজগুলো প্রয়োজনীয় আবার খুব বেশি মনোযোগের দরকারও নেই।" - ইবনু জাওযী

এমন অনেক কিছুই আসে, যা লক্ষ্য থেকে মনযোগ সরিয়ে দেয়। যারা এ ধরনের বিক্ষেপক এড়িয়ে চলতে চান তাদের জন্য ইবনু জাওযী একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তিনি কথোপকথন যথাসম্ভব সংক্ষেপ করতেন। আবার কথার ফাঁকে পেন্সিল ধার করে, লাইব্রেরি পরিষ্কার করে খানিকটা মাল্টি টাস্কিংও করতেন; যাতে একটু সময়ও নষ্ট না হয়।

সবাই আমাদের মতো ঘড়ি ধরে কাজ করবে না, এ ব্যাপারে আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। পৃথিবীতে কিছু মানুষের একমাত্র কাজই বোধহয় সময় নষ্ট করা। আর এ ধরনের লোকেরাই কিছু এমন গ্যাজেট বানিয়েছে, যা আমাদেরও সময় নষ্ট করাবে।

এ ধরনের লোক এবং তাদের উদ্ভাবনগুলো সময় সচেতন ব্যক্তিদের জন্য পরীক্ষার মতো। এই অধ্যায়ে টাইম ম্যানেজমেন্টের শেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটা নিয়ে আলোচনা করব—বিক্ষেপক এড়িয়ে চলা।

সাধারণ কিছু বিক্ষেপক এবং তাদের ক্ষতি

ইমেইল ফাঁদ

ইমেইল এবং ফেসবুক চেক করার জন্য দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় ঠিক করুন, কল ধরা এবং দেওয়ার কাজটিও ওই সময়টাতেই সেরে ফেলুন।

আমরা অনেকেই একটু পরপরই ফোন, ফেসবুক, ইমেইল এসব চেক করি। মেইল আসা মাত্রই পড়ে ফেলি। এভাবে মেইলের পরিমাণ এবং একাউন্টের সংখ্যার সমানুপাতে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়।

এতে করে দুটো বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রথমটা হলো, এভাবে মেইল চেক করতে গিয়ে সারা দিনও পার হয়ে যেতে পারে। হয়তো কোনো কাজের মধ্যেই একটি মেইল এল। সাথে সাথে খুলে দেখলেন এবং জবাবও পাঠালেন। এভাবে সারা দিন যত সময় মেইল খোলা, জবাব দেওয়ার পেছনে গিয়েছে, তা আক্ষরিক অর্থেই ঘণ্টা ছাড়িয়ে যাবে।

এ সমস্যার সমাধান হলো, যোগাযোগের সাথে জড়িত বিষয়গুলো ভাগ করে নেওয়া। অর্থাৎ দিনের কিছু নির্দিষ্ট সময় আলাদা করে বিভিন্ন কাজের জন্য (যেমন, ইনবক্স চেক করা, জবাব দেওয়া) ভাগ করে নেওয়া। তা হলে নানাদিক দিয়ে আপনার সময় বেঁচে যাবে:

- আপনি সবগুলো মেইল একইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেখবেন। এতে করে আপনার অন্য কাজের সময় নষ্ট হবে না।
- মেইলের জবাব আগের চেয়ে দ্রুত দেওয়া যাবে। কারণ, আপনি ওই সময়ে শুধু জবাব দেওয়ার কাজটিই করছেন, তাই আপনি ফোকাসড থাকবেন।
- যদি অনেকগুলো মেইলের জবাব একই রকম হয় তখন কপি/পেস্ট ফাংশন ব্যবহার করতে পারেন।

কোন সময়টাকে এ কাজগুলো করার জন্য বেছে নিচ্ছেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সাধারণ ভুল হলো দিনের শুরুতেই এগুলো করতে যাওয়া। কারণ, মেইলের জবাব দেওয়া খুব বিরক্তিকর একটি কাজ, এটা করতে গিয়ে আপনার মন ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া এর ফলে আপনার মস্তিষ্ক অন্যান্য জটিল কাজ করার মতো সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে।

আবার কোনো মেইলে দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী বা মুডকে প্রভাবিতকারী কিছু থাকলে গোটা দিনের ওপর এর প্রভাব পড়বে।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সফল লোকেরা দিনের মধ্যভাগে মেইল চেক করেন। এর ফলে মন সজীব এবং সতেজ থাকতে থাকতে খুব সকালে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল কাজগুলো সেরে ফেলা যায়। আবার মেইলের উত্তরও দেওয়া হয়েছে অন্য কাজগুলোকে কোনোভাবে প্রভাবিত না করে।

তো বলা যায়, মেইলের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো দুভাবে করা যায়:

- ভাগ করে করা
- দিনের মধ্যে বা শেষে মেইলের জবাব দেওয়া।

ফোন-ফাঁদ

মেইলের পাশাপাশি এখনকার সময়ে আরও অনেক বিক্ষেপক আছে। মেইল ছাড়াও আছে এসএমএস, ভয়েস মেইল, ফোনকল, ফেসবুক নোটিফিকেশন ইত্যাদি। কল ধরা অথবা নোটিফিকেশন আসামাত্রই মোবাইল চেক করার একটি আকর্ষণ আমরা সচরাচরই অনুভব করি। এই আকর্ষণকে দমাতে হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় মোবাইলটা বন্ধই রাখুন। এরপর প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিটের জন্য মোবাইলে নোটিফিকেশন চেক করতে পারেন।

ওই ৫৫ মিনিট আপনি অফলাইন থাকার পরও পৃথিবী কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায়নি। তাই না? বরং আপনি ভালোভাবে আপনার কাজ করতে পেরেছেন এবং তবু প্রতিটা নোটিফিকেশন দেখার জন্য পাঁচ মিনিট সময় পেয়েছেন।

এ ফাঁদ এড়াতে অন্য কোনো পদ্ধতিও অনুসরণ করতে পারেন। পারলে কলগুলোর উত্তর দেবার জন্য একজন সহকারী নিয়োগ করুন। তিনি আপনাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কলগুলোর একটি তালিকা দেবেন, যাদের সাথে দিনের শেষে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও ভয়েস মেইল সুবিধা চালু করতে পারেন, যাতে বুঝতে পারেন কোন কলগুলো ব্যাক করতে হবে।

ফোনকলে থাকাকালেও খেই হারিয়ে ফেলবেন না। ফোনের অপর পাশের মানুষটিকে বলুন, আপনি সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারবেন (অথবা আপনার বিবেচনা অনুযায়ী কোনো সময়) এরপর আপনাকে কাজে ফিরে যেতে হবে। এটা বলা হলে তারা অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন এড়াতে সচেতন থাকবেন এবং যথাসম্ভব মূল বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি ফোনে কথা বলার সময় বলে দিই যে, আমার পছন্দের মাধ্যম হলো ইমেইল। ফোনের চেয়ে মেইলে আমি বিস্তারিতভাবে উত্তর দিতে পারব। এভাবে যখন সবাই বিষয়টা বুঝে গেল তখন ধীরে ধীরে ফোনকলের পরিমাণ কমে

গেল এবং মেইল আসা বেড়ে গেল। এটা আসলে ভালো। মেইলে মূল বক্তব্যকে ঘিরে প্রাসঙ্গিক কথা লেখা হয়। ফোনে কথা বলার সময়ে যেমন অপ্রয়োজনীয় কথা চলে আসে, ইমেইলে তেমন ঘটে না।

কাজের পরিবেশ

আপনার কাজের পরিবেশ কেমন এটাও গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কাজের জায়গায় আপনার চারপাশে কী কী আছে এটা অনেকেই খেয়াল করেন না। অনেক সময় আশপাশে অকাজের জিনিসপত্র রেখে নিজেরাই নিজেদের বিক্ষিপ্ত করি।

আপনার কাজের জায়গায় শুধু সে জিনিসগুলোই রাখুন, যা দিয়ে আপনি কাজ করবেন আর অতিরিক্ত কিছুই না। ডেস্ক, চেয়ার, কম্পিউটার, বই, স্টেশনারি ইত্যাদি সব এমনভাবে রাখুন যাতে আপনার সময় বাঁচে। আর অন্য সবকিছু দৃষ্টির বাইরে তথা মন থেকেও দূরে রাখুন।

যেমন, ডেস্কে যেকোনো ধরনের ম্যাগাজিন রাখাটা মনযোগ বিক্ষিপ্ত করবে। হয়তো কাজ করতে করতে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টিয়ে দেখতে ইচ্ছে হবে। একই ব্যাপার ভিডিও, বিনোদন ওয়েবসাইট, ভিডিও গেমস ইত্যাদি যেকোনো কিছুর ক্ষেত্রেও।

সমাধান হলো সাদামাটা থাকা। যা এই মুহূর্তে দরকার, তা হাতের কাছাকাছি থাকা এবং অন্য সবকিছু প্রয়োজনে না আসা পর্যন্ত দূরে রাখা।

পিপল ট্র্যাপ

অন্য মানুষেরাও আপনার জন্য বিক্ষেপণের কারণ হতে পারেন। খুব মনযোগের কোনো কাজ করার সময় অন্যদের জানিয়ে দিন, যাতে আপনাকে বিরক্ত না করে। নিজের অফিস থাকলে ব্যাপারটা আরও সহজ। অফিসের দরজা বন্ধ রাখুন এবং বন্ধ করার আগে অন্যদের বলে দিন খুব প্রয়োজন ছাড়া যাতে আপনাকে বিরক্ত না করা হয়। ব্যক্তিগত সহকারী থাকলে তিনিই আপনার ফোনকলগুলো সামলাবেন। আপনি ব্যস্ত থাকলে এটাই সবচে ভালো। এটা সম্ভব না হলে ফোন সাইলেন্ট রাখুন, যাতে অন্য কোনো উপায়েও আপনি কারো দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হন।

এটা আবার উন্মুক্ত অফিসগুলোতে খুব কঠিন। নিজস্ব কিউবিকল থাকলে এমন কিছু বানিয়ে নিন, যা বাকিদের বার্তা দেবে যে আপনি ব্যস্ত। এসবকিছুও যদি ব্যর্থ হয় তবে কাজ করার সময় ইয়ারফোন ব্যবহার করুন। এতে করে আশেপাশের কোলাহল আপনার কানে পৌঁছাবে না, আবার কানে ইয়ারফোন আছে, এমন কাউকে সাধারণত মানুষজন তেমন বিরক্ত করে না।

মাল্টি-টাস্কিং প্রবঞ্চনা

আমার টিনএজের সময়ে মাল্টি-টাস্কিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মাল্টি-টাস্কিং যেন ছিল কারো ব্যস্ততা এবং গুরুত্ব নির্দেশক। ফোনে কথা বলতে বলতে রিপোর্ট টাইপ করছেন, আবার সাথে খবর দেখছেন এবং কফি খাচ্ছেন —এমন লোক তখন অহরহ দেখা যেত। একইসঙ্গে অনেক কিছু করাটা যেন গর্ব করার মতো কোনো বিষয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে মাল্টি-টাস্কিং প্রোডাক্টিভিটি কমিয়ে দেয় এবং একইসাথে কাজের মানেও প্রভাব পড়ে। একইসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করলে আমাদের মন কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজে ফোকাস করতে পারে না। ফলে খুব ভালো কোনো ফলাফলও দেখাতে পারি না।

আধুনিক সময়ের টাইম ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞরা একমত যে, একই সময়ে শুধু একটি কাজ মনযোগের সাথে করলে কাজটি দ্রুত এবং ভালোভাবে শেষ হয়। কারো সাথে কথা বলার সময় তার সাথেই পূর্ণ মনযোগ দিয়ে কথা বলুন। বই লিখার সময় অন্য সবকিছু বন্ধ করে লেখার কাজেই ফোকাস করুন। আর মিটিং-এর প্রস্তুতি নিলেও প্রস্তুতির কাজটিই ভালোভাবে করুন।

তা হলে দেখবেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ সারতে পারছেন এবং কাজটির গুণগত মানও ভালো হবে। মাল্টি-টাস্কিং এ অন্য যে কাজগুলো করছিলেন, সেগুলো করার জন্যেও দেখবেন অনেক সময় থেকে যাচ্ছে।

এর মানে কিন্তু একদম এমন না যে, টাইম ম্যানেজমেন্টে মাল্টি-টাস্কিং এর কোনো জায়গা নেই। ব্যক্তিগতভাবে দুটো ক্ষেত্রে মাল্টি-টাস্কিংকে আমি বেশ উপকারী পেয়েছি :

- যেসব কাজে খুব বেশি মনযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, সেসব ক্ষেত্রে আমি কাজটি করতে করতে অডিওবুক বা লেকচারও শুনি। যেমন ধরুন, সাংসারিক বা ছোটখাটো কোনো কাজ। এতে করে আমার মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে না এবং প্রোডাক্টিভও থাকে। আবার আমার হাত অবচেতনভাবে ছোটখাটো কাজটিও করছে। অবশ্য এজন্য কিছুটা মানসিক প্রশিক্ষণ ও দরকার। না-হয় একইসঙ্গে দুটো কাজ করতে গিয়ে ভুল করে ফেলবেন। তা ছাড়া অভ্যস্ত না হলে মনযোগ দিয়ে কাজটি করতে পারবেন না।

- ট্রাফিকে বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়। এটা আগের চেয়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি কিন্তু ঘটনা অনেকটা একই। আমরা প্রায়ই এমন পরিস্থিতিতে পড়ি, যখন চুপচাপ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া বা ট্রাফিকে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এ পরিস্থিতিগুলোতে আপনার কাছে দুটো কাজ করার

Contents

সুযোগ আছে। হয় আপনি রেগেমেগে বিরক্ত হয়ে যাবেন, যা কিনা আপনার মানসিক অবস্থা, প্রোডাক্টিভিটি এমনকি ফিটনেসেও প্রভাব ফেলবে। অথবা এ সময়টাকে আপনি কাজেও লাগাতে পারেন।

যখনই আমার আধ থেকে এক ঘণ্টা সময় লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে, আমি সাথে করে একটি বই (অথবা ই-বুক) নিয়ে যাই। এতে করে সময় নষ্ট হয় না। একইভাবে ট্রাফিকে আটকে গেলে লেকচার জাতীয় কিছু শুনুন। অথবা অফিসে পৌঁছানোর আগে প্রয়োজনীয় কয়েকটা ফোনকল সেরে রাখতে পারেন। তা হলে অফিসে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারবেন। এ সময়টায় নিজের স্বপ্নগুলো নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পাবেন। অথবা এ সময়টায় ইস্তিগফার, যিক্‌র কিংবা দু'আ করতে পারেন।

আবার ট্রেনে কিংবা এয়ারপ্লেনে চড়ার সময় দুশ্চিন্তা বা আবোলতাবোল ভাবনায় সময় নষ্ট না করে এ সময়টা প্রোডাক্টিভ কিছু করার পেছনে দিন। এভাবে দিনশেষে দেখবেন আপনি বাকিদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। এক্ষেত্রে মাল্টি-টাস্কিং সত্যি খুব কাজে দেয়।

ইন্টারনেট থেকে একটি প্রোগ্রাম নামাতে অথবা লোড করতে বেশি সময় লাগলে সে ফাঁকে ছোটখাটো কাজগুলো সেরে ফেলুন। আশা করি আপনার কাছে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয়েছে। ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি হওয়ার আগপর্যন্ত মাল্টি-টাস্কিং পরিহার করুন। লাভ বেশি হলে মাল্টি-টাস্কিংয়ে লেগে পড়ুন।

এটা টাইম ম্যানেজমেন্টের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ—প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানো। প্রতিটা ছোটখাটো সুযোগকে বড় কিছুতে রূপান্তর করা।

অতিরিক্ত কাজের বোঝা

অনেকেই নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেন। এত কাজ করা কীভাবে সম্ভব হবে সে ভাবনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। আপন সাধ্যের ব্যাপারে জানা না থাকলে, অবাস্তব অনুরোধগুলো সুন্দরভাবে না ফেরাতে পারলে কিংবা সময়ের হদিস হারিয়ে ফেললে এমনটা হয়।

> "সময় অপচয় মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। মৃত্যু মানুষকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে; সময়ের অপচয় বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ থেকে। (ইবনুল কায়্যিম রহ.)

অনুরোধে ঢেঁকি না গেলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমন লোক তো রয়েছেই যারা কিনা তাদের কাজগুলো অন্যদের দিয়ে করিয়ে নিতে চায়। ইসলাম আমাদের অন্যদের প্রয়োজন ও সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলে। কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রয়োজনকেও তুচ্ছ করা যাবে না। ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

আর এসব ক্ষেত্রেই আপনাকে দৃঢ়তা গড়ে তুলতে হবে। দৃঢ় হওয়া মানে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেই সবার সাথে কোমলভাবে কথা বলা। কাউকে তাচ্ছিল্য না করে 'না' বলতে পারা। এ পর্যায়ে পৌঁছাতে সময় লাগবে, একই সাথে ভুলও হবে প্রচুর। কিন্তু 'না' বলতে শেখা এমন এক দক্ষতা, যা আপনার নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে খুব প্রয়োজন। এ দক্ষতাটা না শিখলে আমাদের গোটা জীবন অন্যদের কাজ করতে করতেই ফুরিয়ে যাবে। নিজেদের জন্য তেমন কোনো সময় আর অবশিষ্ট থাকবে না। অতিরিক্ত কাজের বোঝা এড়ানোর প্রথম পদ্ধতি হলো বোঝা হতে পারে, এমন জিনিসগুলোকে 'না' বলে দেওয়া।

সময়ের হিসাব রাখুন, এক দিনে কতটুকু কাজ করতে পারবেন, আন্দাজ করে নিন। যে সময়গুলোতে বেশি সক্রিয় থাকেন আর যে সময়গুলোতে অলস, দুটো সময়কেই চিহ্নিত করুন। এরপর দেখুন এর মাঝে একদিনে বা এক সপ্তাহে আপনি কতটুকু কাজ করতে পারবেন। এভাবে আপনি আপনার সাধ্যের সীমাটুকু বুঝবেন এবং সেভাবেই নিজেকে এগিয়ে নিতে পারবেন।

নিজের সীমা জানা হয়ে গেলে অতিরিক্ত কাজ চেনাও সহজ হবে। আর ঠিক এ সময়েই আপনাকে দৃঢ়চেতা হতে হবে। ভদ্রভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন আপনি ওই কাজটি করতে পারবেন না।

কোনো কাজের আয়তন বড় হলে সেটাকে ভেঙে ফেলুন, ছোট ছোট ভাগ করুন। এর মানে এমন আয়তনের ভাগে ভেঙে ফেলা যতটুকু আপনি সামলাতে পারবেন। একটি বড়সড় কাজকে চাপ ছাড়া করার এটাই সবচে উত্তম পদ্ধতি।

ধরুন, আপনি ৮০০ পৃষ্ঠার একটি তাফসীরের বই পড়বেন। কিন্তু এত বিশাল আয়তন দেখে আপনি বই খুলতেই ভয় পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে বইটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলুন। ঘাবড়াবেন না, ছিঁড়ে ফেলতে বলছি না। যতটুকু আপনি একদিনে পড়তে পারবেন, তার একটি খসড়া চিন্তা করুন। ধরুন, একদিনে ২০ পৃষ্ঠা। এভাবে পড়লে আপনি ৮০০ পৃষ্ঠার বই মাত্র ৪০ দিনে শেষ করতে পারবেন! অসম্ভব কাজটিকেই খুব সহজ মনে হবে।

বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট সময় না রাখাতেও অনেকে চাপ অনুভব করেন। একটি ব্রেক নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়ার আগপর্যন্তই আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করতে

পারে। এজন্য প্রতি ঘণ্টায় কমপক্ষে ৫ মিনিটের বিশ্রাম প্রয়োজন। এভাবে আপনার মন সতেজ থাকে এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারবে।

বার্নআউট ফাঁদ

কোনো প্রকার বিশ্রাম কিংবা আনন্দ বিনোদন ছাড়াই কাজ করে গেলে বার্নআউট হয়। আমরা যতই পুরো সময়টা কাজে লাগাতে চাই না কেন, এটা সম্ভব না। আমাদের শরীর-মন একটি পর্যায়ে গিয়ে থেমে যায়, আর চলতে চায় না। কিছুক্ষণ কাজ করার পরই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কাজ করার গতি কমে আসে। নিজের শতভাগ দেওয়াটাও তখন আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এমন পরিস্থিতিতে যখন পড়বেন, তখনই সময় বিশ্রাম নেওয়ার, একটি ছোট বিরতির। বার্নআউট এড়াতে আমরা অনেকভাবে ব্রেক নিতে পারি :

- প্রতি ঘণ্টায় ৫ মিনিটের বিরতি
- দুপুরের খাবার আগে ১ ঘণ্টার বিশ্রাম
- প্রতি সন্ধ্যায় ১-২ ঘণ্টার আনন্দ-বিনোদন
- সপ্তাহে একদিন কাজের কথা একেবারে ভুলে যাওয়া
- বছরে ১-২ বার রুটিনের বাইরে ছুটি নেওয়া

হালালভাবে আনন্দ ও মজা করা নিয়ে অপরাধবোধের কিছু নেই। আল্লাহ এ পৃথিবীর ভালো ভালো জিনিসগুলো আমাদের উপভোগের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর মন উৎফুল্ল রাখার জন্য এবং ভালোভাবে কাজ করতে পারার জন্য বিনোদন খুব দরকার। বিনোদন ছাড়া আমাদের মন-মেজাজ ঝিমিয়ে পড়ে আর একাগ্রতাও হারিয়ে যায়।

আবার খুব বেশি বিনোদনে ডুবে থেকে সময়ের খেই হারিয়ে ফেলাও উচিত না। ভারসাম্য থাকাটা জরুরি। আর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বিনোদনের চাইতে বেশি প্রাধান্য দেওয়াই ভারসাম্য।

বিরতির সময় এমন কিছু করুন, যা আপনার কাছে সত্যিই আনন্দদায়ক। সেটা হতে পারে হাঁটাহাঁটি, হালাল কিছু দেখা, বই পড়া, ব্যায়াম করা অথবা শুধুই কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ন্যাপ নেওয়া। কাজ নিয়ে একদমই ভাববেন না, শুধুই আরাম করুন।

অনেকেই ছুটি কাটাতে চান না। তাদের কাছে ছুটি কাটানোর জন্য টাকা খরচ করাটা বিলাসিতা মনে হয়। এরচেয়ে কাজ করাকে তারা ভালো মনে করেন। যদিও

এ আচরণটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো, কিন্তু জীবনের টানাপড়েন থেকে মুক্তি পেতে মাঝে মাঝে ছুটির দরকার।

ছুটি কাটানো মানেই অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হবে, তা না। পৃথিবী জুড়ে অনেক জায়গাতেই ছুটি কাটানোর জন্য যাওয়া যেতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা জায়গাগুলোকে পছন্দ করি যেমন, পাহাড়, সমুদ্র, দ্বীপ। যেখানে গেলে প্রকৃতির কাছাকাছি যাওয়া যাবে, সৃষ্টিকর্তার মহিমা অনুভূত হবে, একইসাথে আত্মিক জাগরণও ঘটবে।

উমরা আমার জন্য বেশ উপকারী কিন্তু উমরা করতে সাধারণত অনেক খরচ হয়। তাই যখন তখন যাওয়া সম্ভব না। মাক্কা-মাদীনার আধ্যাত্মিক প্রশান্তিময় পরিবেশ ভ্রমণকারীর আত্মিক জগতে, তার বিশ্বাসে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদি উমরা না করে থাকেন এবং আপনার সামর্থ্য থাকে, তা হলে উমরা পালন করে আসুন। এটা এমন একটি যাত্রা, যা আপনি কখনও ভুলবেন না।

যা যা করব

দিনের যে সময়গুলোতে আপনি সবচে বেশি সক্রিয় থাকেন, আপনার মনযোগ থাকে চূড়ায়, সে সময়গুলো চিহ্নিত করুন। আর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সে সময়ে করবার শিডিউল করুন। এ সময়গুলোতে ছোটখাটো কাজ করা একেবারে বোকামো। এ কাজগুলো যেকোনো সময়ে করা যেতে পারে। এ সময়তে বরং খুব মনযোগ প্রয়োজন এমন কাজগুলো করুন। এতে করে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ভালোভাবে অথচ দ্রুত শেষ করা সম্ভব হবে।

অধিকাংশ মানুষের সক্রিয়তা হয় শেষ রাতে অথবা ভোর বেলায় সর্বোচ্চ থাকে। আমার জন্য এ সময়টা হলো শেষ বিকেল। প্রতিটা মানুষই ভিন্ন ভিন্ন। আপনার সময়টা চিহ্নিত করুন আর কাজে লাগান।

আপনার কম সক্রিয় সময় চিহ্নিত করুন আর অল্প পরিশ্রমের কাজগুলো সে সময়ে করুন।

কম সক্রিয় সময় হলো সে সময়, যখন আপনি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে, কিছু করার মতো মানসিক স্থৈর্য আপনার হারিয়ে যায়। এ সময়গুলো হতে পারে অফিস ছুটির আগে শেষ বিকেল, লাঞ্চ ব্রেকের আগের ঘণ্টা অথবা খুব সকাল বেলায়। এক্ষেত্রেও সবাই সবার মতো। আপনার কম সক্রিয় সময়টাও চিহ্নিত করুন আর সে সময়ে অল্প পরিশ্রমের কাজগুলো করে ফেলুন। এ কাজগুলোতে ফোকাসের প্রয়োজন কম। যেমন মেইল চেক করা, অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে ফেলা, অফিস

গোছানো অথবা অন্যান্য ছোটখাটো কাজ। এ কাজগুলোতে আপনার সেরাটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তো কেন আপনার সেরা সময়টা এসবের পেছনে দেবেন?

মনযোগ দেবার উপযোগী একটি পরিবেশ গড়ে তুলুন। সব ধরনের বিক্ষেপক সে পরিবেশ থেকে সরিয়ে ফেলুন।

আপনার কাজের পরিবেশ অপ্রয়োজনীয় বিক্ষেপক মুক্ত থাকতে হবে। এমনকি আপনার PCও। এক ঘণ্টা বা একটি দিন সময় নিন, দেখুন সব জিনিস জায়গামতো আছে কি না। নাকি অতিরিক্ত কিছু দখল করে আছে। যদি জিনিসটি ওই জায়গায় থাকার কথা না থাকে আর আপনার মন বিক্ষিপ্ত করে তবে সরিয়ে ফেলুন। যদি ওই জায়গারই হয় তবে এমন কোনো জায়গায় রাখুন, যেখানে সহজে পাওয়া যাবে কিন্তু এর দ্বারা আপনার মনযোগ বিক্ষিপ্ত হবে না। কাজ সহজ করতে একটি গোছানো পরিবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বার্নআউট মোকাবিলা করার জন্য একটি ব্যক্তিগত পদ্ধতি ঠিক করে নিন।

এর মানে হতে পারে ৫ মিনিটের ব্রেকে আপনি কী করবেন তা চিহ্নিত করা। কেউ কেউ এ সময় পাওয়ার ন্যাপ নেন, কেউ হাত-পা ছুড়ে ব্যায়াম করেন। আবার অনেকে ছোট ভিডিও ক্লিপ কিংবা মজার কোনো লেখা পড়তে পছন্দ করেন। আপনার ক্ষেত্রে কোনটা বেশি কার্যকর, সেটি বের করুন এবং ওই ৫ মিনিটে শুধু সেটিই করুন।

একইভাবে কাজের পরে স্ত্রী আর বাচ্চাদের জন্য সময় ঠিক করুন। সাথে সাথে সপ্তাহের একটি দিন নিজের জন্য এবং পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য রাখুন।

কোথাও ছুটি কাটাতে যাবার আগে থেকেই পরিকল্পনা করতে ভুলবেন না। কারণ, আপনাকে আগেভাগেই টাকা জমাতে হবে আবার অফিস থেকেও ছুটি নিতে হবে। ছুটিগুলো বছরের সে সময়ে কাটান, যখন সত্যিই মনে হয় একটি ব্রেক না নিলে বার্নআউটের শিকার হবেন।

কোন কাজগুলো আপনি অন্যদের দিয়েও করাতে পারেন, সেগুলো চিহ্নিত করুন। এমন কাজ দু-ধরনের:

এমন কাজ যা সবাই করতে পারে। যে কাউকে দিয়ে করানো গেলে আপনি কেন করতে যাবেন? কপি করা, ডকুমেন্ট প্রিন্ট করা, হল গোছানো ইত্যাদি এমন কাজ।

যেসব কাজে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের দক্ষতা প্রয়োজন। যেসব কাজ আপনি পারেন না, বরং দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কেউ পারবে সেসব কাজের ভার নিজের কাঁধে নিবেন না। যদি এসব কাজ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর না করেন, তবে আপনার কাজ গুণগত মান হারাবে এবং সব গণ্ডগোল পাকিয়ে যাবে।

এই দুই শ্রেণিবিভাগে পড়ে, এমন সব কাজ হস্তান্তর করাই ভালো। অন্য কাউকে করতে দিন। অন্য কেউ হতে পারে—ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবারের কোনো সদস্য অথবা একজন ভলান্টিয়ার।

যে কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই, সেগুলো থেকে দ্রুত নিজেকে মুক্ত করুন।

অনেক কাজ আমাদের টু-ডু লিস্টে থাকলেও কোনো গুরুত্ব বহন করে না। কারণ, অপ্রাসঙ্গিক অনেক কিছুই এতে থাকে।

আপনার লিস্টে চোখ বুলিয়ে যাবেন। ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগবে না, এ ধরনের কাজগুলো থেকে নিজেকে পৃথক করে নিন। তা হলে প্রয়োজনীয় কাজগুলোর জন্য আপনি যথেষ্ট সময় পাবেন।

টাইম ম্যানেজমেন্ট টিপস

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রধান কিছু মূলনীতি সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপসের কথা জানব, যা আগের অধ্যায়গুলোর মূলনীতিগুলোর মধ্যে পড়ে না। এ টিপসগুলো কিছু উপবিভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি, প্রাসঙ্গিক কারণে কিছু কিছু টিপস পুনরাবৃত্তিও হয়েছে।

দুই মিনিট রুল

দুই মিনিট রুল টাইম ম্যানেজমেন্টের খুব জনপ্রিয় একটি ধাপ। এর মানে হলো কোনো কাজ করতে যদি দুই মিনিট বা এর কম সময় লাগে, তা হলে সেটা সাথে সাথে করে ফেলা উচিত।

তবে এটা সব সময় অনুসরণ করা উচিত না। বিশেষ করে মনযোগ দিয়ে কোনো কাজ করার সময় এ টিপটা মোটেও প্রয়োগ করবেন না। সাধারণত এই টিপটা প্রয়োগ করা হয় ইমেইলের উত্তর দেওয়া অথবা কল ব্যাক করার ক্ষেত্রে। অথবা বড় কোনো কাজ করার মাঝের ফাঁকা সময়ে।

এ নীতিটির মূল্যবান দিক হলো, ছোটখাটো কাজগুলো আর জমে না থাকায় চাপ থাকে না। তখন বড় কাজগুলোতে মনযোগ দেওয়া সহজ হয়।

গোছগাছ রাখুন

টাইম ম্যানেজমেন্টের আর একটি সাধারণ নিয়ম হলো, যার কাজের জায়গা অগোছালো তার টাইম ম্যানেজমেন্ট খুব একটি ভালো হয় না। অপরদিকে গোছানো কাজের জায়গা কার্যকরী টাইম ম্যানেজমেন্টে সহায়ক হয়। এটা আসলে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান।

কারণ, কাজের জায়গাটা গোছানো থাকা মানে আপনি জানেন আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো কোথায় আছে। যখনই দরকার হবে, হাতের কাছেই পাবেন। অন্যদিকে অগোছালো টেবিলে একটি কলম অথবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। গোছগাছ থাকাটা সময় বাঁচানোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য কিছু টিপস :

এই মুহূর্তে যে জিনিসটা আপনার কাজে লাগছে সেটা ছাড়া বাকি সবকিছু টেবিল থেকে দূরে রাখুন।

প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র একইসঙ্গে এমনভাবে রাখুন, যাতে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

স্টেশনারি জিনিসপত্র সব একত্রে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় রাখুন।

এ মুহূর্তে কাজে লাগতে পারে এমন সবকিছুই আপনার কাজের টেবিলে কাছাকাছি রাখুন। কাজ করতে গিয়ে যদি দেখেন আপনার প্রয়োজনীয় কাগজটা ড্রয়ারে তখন সে কাগজটা পেতে গিয়েও সময় নষ্ট হবে।

আপনার কম্পিউটারও একটি পদ্ধতি অনুযায়ী রাখুন। ডেস্কটপটা অগোছালো করে রাখবেন না, সব ফাইল ফোল্ডারে ভাগ করে রাখুন যাতে প্রয়োজনে খুঁজে পান।

উদাহরণস্বরূপ, আমার ডেস্কটপে শুধু তিনটা ফোল্ডার আছে: Works, Videos ও ব্যক্তিগত প্রজেক্ট। প্রতিটি ফোল্ডারে অনেকগুলো সাব-ফোল্ডার আছে, যার ভেতরে আছে আরও সাব-ফোল্ডার। এতে করে আমার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু পাওয়া সহজতর হয়ে গিয়েছে।

ধরুন, আমার ২০১২ সালের একটি ডকুমেন্ট প্রয়োজন পড়েছে। এজন্য আমি প্রথমে 'work' ফোল্ডারে যাব, এরপর 'archive' এ, তারপর '২০১২' লেখা ফোল্ডারে গেলেই ডকুমেন্টটা খুঁজে পাব। এ পদ্ধতিতে আমার অনেক সময় বেঁচে গিয়েছে এবং একইসঙ্গে এটা খুবই কার্যকরী একটি পদ্ধতি। এর অতিরিক্ত উপকার হলো, একটি পরিচ্ছন্ন, ঝঞ্ঝাটহীন ডেস্কটপ দেখতে মানসিক শান্তি অনুভূত হয়। অগোছালো ডেস্কটপ অগোছালো মনেরই ছায়া আর গোছানো ডেস্কটপ গোছানো মনের প্রতিচ্ছবি।

শর্টকাট টিপস

টাইম ম্যানেজমেন্ট মানেই শর্টকাট। আর আধুনিক যুগে আপনার কাজ সহজসাধ্য করার জন্য শর্টকাটের অভাব নেই। একটু সৃজনশীলভাবে ভেবে দেখলে আপনার কাজ সহজ করে দেওয়ার মতো বহু শর্টকাট আপনিও পেয়ে যাবেন।

কিন্তু শর্টকাট প্রয়োগ করার সময় দুটো নিয়ম আপনাকে খুব ভালোভাবে মেনে চলতে হবে:

- অবশ্যই হালাল হতে হবে
- প্রোডাক্টের মানের ব্যাপারে আপস করা যাবে না।

কিছু শর্টকাট যা আমার কাজ আগের চেয়ে আরও ফলপ্রসূ করে দিয়েছে:

কম্পিউটারের শর্টকাট কি (Key)

একটু সময় নিয়ে কম্পিউটারের সব শর্টকাট কি'র ব্যাপারে জেনে নিন। আলাদাভাবে এরা হয়তো আপনার মাত্র ৫-১০ সেকেন্ড সময় বাঁচাচ্ছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে আপনার আসলে কয়েক ঘণ্টা সময় বেঁচে যাচ্ছে।

যেমন, অনেকে কপি-পেস্ট করেন ড্রপ ডাউন মেনু ব্যবহার করে। তারা একটি লেখাকে হাইলাইট করে, স্ক্রিনে রাইট ক্লিক করে কপি করে এরপর যে জায়গায় পেস্ট করতে হবে সেখানে গিয়ে মেনু থেকে পেস্ট ক্লিক করেন। অথচ এই সম্পূর্ণ কাজটি CTRL+C (কপি করার জন্য) আর CTRL+V (পেস্ট করার জন্য) চেপে কয়েক সেকেন্ডেই করা যেত। এতে করে আপনার অনেক সময় বেঁচে যাচ্ছে। এ ধরনের আরও কিছু শর্টকাট কি আছে। আমার পরামর্শ থাকবে একটি ক্র্যাশ কোর্স করে হলেও এ শর্টকাটগুলো সব শিখে নেওয়া।

পুরোনো লেখাগুলো আবার ব্যবহার করুন

আমি যা-ই লিখি বা লেখার প্রস্তুতি নিই এর কোনো কিছুই মুছে ফেলি না। এটা আমার একটি ব্যক্তিগত নিয়ম। হোক সেটা লেকচার নোট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অথবা একেবারে আমার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা থেকে লেখা কিছু। এসবই আমি রেখে দিই, যাতে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে আমাকে একটি কোর্স কয়েক সেমিস্টার ধরে পড়াতে হয়। যখন প্রথমবার আমি কোর্সটা করাচ্ছি তখন বেশ শ্রম আর সময় দিয়ে হলেও আমি ভালোভাবে লেকচার নোটটা তৈরি করি। গবেষণাও করি প্রচুর, যাতে নোটটা খুব ভালো হয়। এরপর এই নোটগুলো আমি সেভ করে রাখি আর প্রতি সেমিস্টারে খানিকটা সম্পাদনা আর আগের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করে করে আবার ব্যবহার করি। এভাবে নতুন করে নোট তৈরি করতে গিয়ে আমার আর সময় নষ্ট হলো না বরং আমি অতিরিক্ত সময়টা গবেষণা আর লেখা আরও উন্নত করার পেছনে দিতে পারছি।

শর্টকাট পথ চেনা এবং ট্রাফিক এড়িয়ে চলা

আমরা কোনো একটি গন্তব্যে পৌঁছাতে প্রায়ই একটি নির্দিষ্ট রুট অনুসরণ করি। ফলে নতুন কোনো পথে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা তেমন একটি চেষ্টাও আর করি না। একটি পথেই সব সময় যাওয়া আসা করি, অন্য পথ ব্যবহার করতে সাহস পাই না। কয়েক বছর আগে একদিন একঘেয়েমি কাটাতে আমি গাড়ি নিয়ে বের হই। হঠাৎ ভাবলাম আজকে একটু ভিন্ন পথে যেয়ে দেখি। সেদিন আবিষ্কার করলাম ওই পথটা আসলে আমার খুব প্রিয় একটি শপিং মলের শর্টকাট। এই পথটা ধরে গেলে ২০ মিনিট সময় বেঁচে যাবে। তখন থেকে আমি সব সময় যেকোনো জায়গায় যাওয়ার শর্টকাটগুলো জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

একইসঙ্গে আপনি ট্রাফিকও এড়াতে চাইবেন। বিশেষ করে যদি ট্রাফিকে বসে আপনার গঠনমূলক কোনো কাজ না হয়ে থাকে। ট্রাফিক এড়ানোর সবচে ভালো কৌশল হলো অন্যদের চেয়ে আগে কাজে যাওয়া এবং বাসায় অন্যদের চেয়ে খানিকক্ষণ পরে ফেরা। এটা আবার অফিসে আপনার প্রমোশন পেতেও কাজে লাগতে পারে। কারণ, আপনার বস দেখবেন আপনি আসছেন, সবার আগে আবার যাচ্ছেন সবার পরে। এটা কোন বসের না ভালো লাগে, বলুন!

ফোন কল নয়, ইমেইল করুন

এটা আমার ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার। প্রাথমিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আমি ইমেইলকেই প্রাধান্য দিই। কারণটা বেশ সহজ—এতে সময় বাঁচে। ফোনকলে অনেকেই অপ্রাসঙ্গিক এবং অতিরিক্ত কথা বলেন, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করেন। এরচেয়েও বাজে হলো অনেকে যখন তখন ফোন করেন, এমনকি মধ্যরাতেও।

আমার ব্যক্তিগত নিয়ম মেনে খুব কমই আমি ফোনকল রিসিভ করি। শুধু পরিবারের কেউ বা খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে তখনই ব্যতিক্রম হয়। ফোনে কথা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করি এবং সবাইকে মেইলেই যোগাযোগ করতে বলে দিই। ইমেইলে সাধারণত সরাসরি মূল কথাটাই উল্লেখ থাকে, অপ্রয়োজনীয় কথা কম থাকে। আর আপনার পছন্দমতো সময়েই মেইলের উত্তর পাঠাতে পারেন।

আর আপনি ফোনকলই পছন্দ করলে ভয়েসমেইল ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে সব কলের উত্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে দিয়ে দেওয়া যাবে। কথা বলার সময় সময়সীমাও বেঁধে দিতে পারেন। কথাটা এভাবে বলতে পারেন যে, আপনার পাঁচ মিনিট কথা বলার সময় আছে। এতে করে যিনি কল দিয়েছেন যথাসম্ভব সরাসরি এবং প্রাসঙ্গিক কথাই বলবেন।

যে উপায়ই আপনি বেছে নেন, কাজের সময় দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথা বলবেন না। এটা প্রচুর সময় নষ্ট করে। তাই আরও কার্যকর কোনো মাধ্যম বের করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য কাউকে করতে দিন

সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব আমাদের দিশেহারা করে ফেলে। সবকিছু আপনাকেই করতে হবে, আপনাকেই পারতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আবার একজন মানুষ সব বিষয়ে সমান দক্ষও না।

আশপাশে এমন অনেকেই আছেন, যারা আপনার কাজটি করতে পারবেন, তাদের কাছে দায়িত্বটা অর্পণ করুন। এভাবে অনেক সময় বেঁচে যায়।

অন্য কাউকে দিয়ে দুভাবে কাজ করানো যায়:

- কাজটি আপনার ক্ষেত্রের বাইরে হলে কাজটি সে ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ কারো কাছে অর্পণ করুন। এভাবে আপনার সময়ও বাঁচবে আবার কাজের মানও ভালো হবে। অবশ্য সেজন্য আপনি যে কাজটিতে অভিজ্ঞ না, এটা স্বীকার করে নেওয়ার মতো বিনয় আপনার থাকতে হবে।

- আর যদি কাজটি এত সহজ হয় যে কাউকে শেখালে সে-ই করতে পারবে, তা হলে কাউকে কাজটি শেখান। সে শিখে গেলে এরপর থেকে তাকে দিয়েই কাজটি করান।

২০১৩ সালে আমি আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট (www.abumuawiyah.com) খোলার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু ওয়েবসাইট তৈরির নিয়মের ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞানই নেই। তবুও আল্লাহ আমাকে খুব ভালো কিছু বন্ধু এবং ছাত্র দিয়েছেন, যারা সব সময় আমার প্রয়োজনে এগিয়ে আসে। ওয়েবসাইট ডিজাইন কোম্পানির মালিক একজন ছাত্র আমার জন্য ফ্রিতে ওয়েবসাইটটা তৈরি করে দিল। সে এবং তার দল ওয়েবসাইট ডিজাইনের কাজ করতে করতে আমার এক বন্ধু ওয়েবসাইটের জন্য লোগো বানিয়ে দিল। আরেকজন বন্ধু ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য আমার অডিও লেকচারগুলোর প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিল।

এভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়ে গেল। আর এটা হয়েছে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ কিছু লোকদের স্বেচ্ছাসেবার সাহায্যে। আপনারা লিংকে গিয়ে ওয়েবসাইটটা দেখে আসতে পারেন। দেখার সময় ভুলে যাবেন না যে, এটা তৈরি করেছে একদল স্বেচ্ছাসেবী। পরিকল্পনা আর কাজ ভাগ করে দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করতে হয়নি।

সবাই এমন স্বেচ্ছাসেবী পান না। কিন্তু কাউকে দিয়ে টাকার বিনিময়ে কাজ করিয়ে নিলে যদি সময় বাঁচে, তা হলে টাকা খরচ করাটা যথার্থ। এতে করে আমরা অন্য কাজে মনোনিবেশ করার মতো সময় পাই, অল্প সময়ে অনেক কাজ করাও সম্ভব হয়। এ অর্থে, একজন Personal Assistant বা Virtual Assistant সে কাজগুলো সামলাতে পারেন, যা আপনার নিজ হাতে করার প্রয়োজন নেই। আর তাই একজন PA বা VA রাখাটা যথার্থ।

আজকেও আমি অনেকগুলো কাজের দায়িত্ব কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীকে দিয়েছি। এদের কেউ কেউ আমার ফেসবুক পেজ চালায়, কেউ টুইটার অ্যাকাউন্ট, আবার কেউ একই রকম মেইলগুলোর জবাব দেয়, বই এবং আর্টিকেল সম্পাদনা করে, সাথে অডিওগুলোও। অন্যদিকে এতে করে আমি লেখালেখি, শিক্ষকতা, গবেষণা এবং পড়াশোনা ছাড়াও পরিবারের সাথে ভালো একটি সময় কাটানোর সুযোগ পাই।

কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াটা অনেক সময় বাঁচিয়ে দেয়। একজন সাধারণ মানুষ এক দিনে যতটুকু কাজ করতে পারেন, এরচেয়েও বেশি কাজ করা সম্ভব হয়।

প্রযুক্তির সহায়তা নিন

প্রযুক্তিগত উন্নতির এই যুগে সব কাজ মানুষকে দিয়ে করানোর আর দরকার নেই। আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজেই এখন আমরা প্রযুক্তির সহায়তা নিতে পারি। একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনার কাজটি সহজে করে দেওয়ার মতো কোনো প্রযুক্তি বা সফটওয়্যার আছে কিনা। থাকলে কাজে লাগান, এতে আপনার অনেক সময় বেঁচে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি নির্দিষ্ট ধরনের কিছু ইমেইল পান, যাদের উত্তর হবে একইরকম। এসব ক্ষেত্রে সবাইকে আলাদা আলাদাভাবে একই উত্তর দেওয়া সময়সাপেক্ষ এবং একই সাথে বিরক্তিকর। এক্ষেত্রে আপনি একটি অটোমেটিক রেসপন্সের সাহায্য নিতে পারেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মেইলের জবাব পাঠিয়ে দেবে।

এর আরও একটি ভালো উদাহরণ আছে। আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, সেখানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেওয়ার জন্য আগে আমাকে অনেক সময় দিতে হতো। প্রতিটা অনলাইন সেশনে গিয়ে দেখতে হতো কে কে উপস্থিত ছিল। এভাবে অনেক সময় নষ্ট হতো। কিন্তু পরে আমাদের আইটি বিভাগ সুন্দর একটি সমাধান নিয়ে আসে। তারা এমন একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেছে, যার ফলে কোনো শিক্ষার্থী ক্লাসে লগইন করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের উপস্থিতি রেজিস্ট্রিতে যুক্ত হয়ে যায়।

দ্রুত পড়া এবং দ্রুত শোনা

সব বই-ই ধীরে ধীরে এবং বুঝে বুঝে পড়ার মতো না। আবার সব এক ঘণ্টার লেকচার শুনতে এক ঘণ্টা লাগে না। দ্রুত পড়তে পারাটা একটি দক্ষতা, যেটা আপনার সময় বাঁচিয়ে দেবে। একইসঙ্গে অনেকগুলো বই পড়ার সুযোগও পাবেন।

আধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে এখন অডিও লেকচারও দ্রুত শোনা যায়। VLC মিডিয়া প্লেয়ারের মতো কিছু মিডিয়া প্লেয়ারে দ্বিগুণ গতিতে অডিও শোনা যায়। আমাদের কান এবং মস্তিষ্ক দুটোই দ্বিগুণ গতির অডিও ভালোভাবেই শুনতে পারে এবং বুঝতেও পারে। এর কারণ অডিওতে সাধারণত যে গতিতে কথা বলা হয়, বাস্তবে আমরা এরচেয়ে দ্রুতগতির কথা শুনে থাকি এবং ভালোভাবে বুঝতেও পারি। ফলে লেকচারের গতি বাড়িয়ে দিলেও সমস্যা নেই। এতে করে দুই ঘণ্টার লেকচারও আপনি এক ঘণ্টায় শুনে ফেলতে পারবেন।

অকাজ কাম্য নয়

আপনার কাছে যে কাজ আসে তার সবই করতে হবে এমন কিন্তু নয়। প্রায়ই আমরা এমন কিছু কাজের চাপ নিই, যেগুলোর আসলে কোনো মূল্য নেই। কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকার নামে আসলে আমরা সময়ের অপচয় করছি।

এখানে মূল কথা হলো, কোনো কাজ হাতে নেওয়ার আগে সে কাজটির সর্বশেষ প্রভাব নিয়ে ভাবুন। যদি কাজটি থেকে কেউ উপকৃত না হয় এবং এটা শুধুই সময় কাটানোর জন্য হয়, তবে সেটা অকাজ। অকাজটি করবেন না, বাদ দিন।

অন্য কারো জন্য কাজ করলে আগে তার সাথে আপনার কাজ নিয়ে কথা বলুন। যদি দুজনেই মনে করেন যে, কাজটি কারো কোনো উপকারে আসবে না তবে কাজটি অনুমতি সাপেক্ষে ছেড়ে দিন। এর পরিবর্তে কোম্পানির কাজে আসবে এমন কিছু করুন।

শৃঙ্খলা মেনে চলতে টিপস

পুরো বই জুড়ে টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য কঠোর শৃঙ্খলার প্রয়োজনের কথা উঠে এসেছে। শিডিউল মেনে চলতে যে শৃঙ্খলা প্রয়োজন, কিছু টিপস অনুসরণ করলে সেগুলো সহজে আয়ত্তে আসবে:

সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য রিমাইন্ডারের ব্যবস্থা রাখুন

নোটবুক, ট্যাব, স্মার্টফোন, ডায়েরি অথবা ডেস্কটপ প্ল্যানার—আপনার কাছে যেটাই থাকুক, গুরুত্বপূর্ণ কাজের রিমাইন্ডার পেতে এসব কাজে লাগান। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যাতে আপনি ভুলে না যান তাই কোথাও লিখে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

রিমাইন্ডার নানা রকম হতে পারে, ছোটবড় সব গুরুত্বপূর্ণ কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। গাড়ির মেকানিককে ফোন দেওয়ার রিমাইন্ডার, ক্লাস নেওয়ার রিমাইন্ডার অথবা অমুক দিন বিল পরিশোধ করার রিমাইন্ডার। কাজটি ছোট হোক বা বড় লিখিত রিমাইন্ডার ঠিক করে রাখুন, সে কাজটি তখন ভুলে যাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

ছোটখাটো কাজ আর সৃজনশীল কাজ একইসঙ্গে নয়

আধুনিক সময়ে সব কাজই হয় প্রচুর ভাবনা-চিন্তা, সৃজনশীলতা আর পরিকল্পনার সমন্বয়ে। সৃজনশীল যেকোনো কাজ করার সময় অন্য কোনো হাতের কাজ করা একদমই উচিত না। কারণ, সৃজনশীল কাজ মানেই এতে প্রচুর মনযোগের প্রয়োজন রয়েছে। এর সাথে অন্য কোনো কাজ করাটা বোকামি। এ প্রসঙ্গে আমরা মাল্টিটাস্কিং-এর কথা তুলে আনতে পারি, যা আমি আগেও বলেছিলাম।

সৃজনশীল কাজে মস্তিষ্ক একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে কাজ করে। অন্যান্য কাজগুলোতে আবার মন আরেকভাবে অগ্রসর হয়। দুটো একইসঙ্গে করা মোটেও প্রোডাক্টিভ নয়, আবার সৃজনশীল কাজের সাথে অন্য কাজ করতে গিয়ে মাথাব্যথাও হতে পারে।

সৃজনশীল কাজের জন্য আলাদা সময় ঠিক করুন। গোছগাছ করা, ছোটখাটো কাজ সারা এগুলো অন্য সময়ে করুন। এভাবে আমাদের মন বর্তমানে যে কাজ করছে, তাতে মন দিতে শেখে। যদি সকালবেলা আপনার সৃজনশীল সময় হয়, তবে সকালেই সৃজনশীল কাজের সময় নির্ধারণ করুন আর দুপুরে অন্য কাজ।

এখানে মূল কথা হলো নিজের মনকে এই মুহূর্তের কাজে মনোযোগ দিতে অভ্যস্ত করে তোলা। আর সাথে সাথে আপনার কাজগুলো আরও দ্রুত সেরে ফেলতে সক্ষম হওয়া।

অবচেতনে ভাবনাচিন্তা

আমাদের মস্তিষ্ক দুটো ভিন্ন মাত্রায় চিন্তাভাবনার কাজ করে। একটি সচেতন মাত্রায়, আরেকটা অবচেতনে। সচেতন অবস্থায় সামনের কাজটি করা মানে ওই কাজটিতেই ফোকাস করা। কিন্তু আমাদের মনের ভেতরে আরও অনেক কিছু ঘটছে, যার ব্যাপারে আমরা ওয়াকিফহাল নই। এটা হলো অবচেতন।

সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, আমাদের অবচেতন মনে অনেক চমৎকার চমৎকার আইডিয়ার জন্ম হয়। কারণ, অবচেতন মন আসলে কখনোই ঘুমায় না, বিশ্রাম করে না। আর এখান থেকেই 'সমাধান না পেলে ঘুমাও' এই স্লোগানটা এসেছে। অনেকেই যখন জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারেন না, তারা হয় কিছুক্ষণ ঘুমান অথবা মজার কিছু করেন। এর ফাঁকে তাদের অবচেতন মনে সমস্যাটার ব্যবচ্ছেদ চলতে থাকে—কোনো হট্টগোল ছাড়াই এবং দ্রুত একটি সমাধান বের হয়ে আসে।

এরপর যদি কখনও জটিল কোনো সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন কিংবা সৃজনশীল কিছু করার ইচ্ছা আপনাকে তাড়া করতে থাকে, তা হলে ঘুমিয়ে পড়ুন। খুব সম্ভব আপনি যা চাইছেন তা পেয়ে যাবেন।

সম্ভবত এজন্যই আমাদের চমৎকার সব আইডিয়ার খোঁজ মেলে সালাতে দাঁড়ালে। কারণ, তখন আমরা শান্ত এবং ফোকাসড থাকি আর আমাদের অবচেতনও মনের গভীরে ডুব দিয়ে দেখার সুযোগ পায়। (এই বইটি লেখার আইডিয়াও আমি এভাবেই পেয়েছি।)

নিজেকে পুরস্কৃত করুন

এ পৃথিবীতে সবাইকে আপনার পক্ষে কখনোই পাবেন না। সবাই কখনও আপনার আইডিয়াগুলোকে বাহবা দেবে না বা আপনার প্রচেষ্টাগুলোর প্রশংসা করবে না। কিন্তু আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। তাই নিজেই নিজেকে অনুপ্রেরণা দিন, কঠিন দিনগুলো পার হতে নিজেকে সাহস দিন।

নিজেকে উৎসাহিত করার একটি দিক হলো নিজের সব ছোটবড় অর্জনে নিজেকে পুরস্কৃত করা। এটা আপনার এগিয়ে চলার গতি বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে, সাফল্যের পথটাও সহজ করে দেবে। ছোটখাটো অর্জনগুলো ছোট ছোট উপহার দিয়েই উদ্‌যাপন করুন। উদাহরণ হিসেবে ধরুন, আপনার একটি রিপোর্ট লেখা বাকি ছিল। আপনি সেটা লিখে শেষ করেছেন ঠিক সময়ের ভেতরেই। এজন্য ১০ মিনিটের একটি ব্রেক আর এক কাপ কফি খেয়ে নিজেকে পুরস্কৃত করুন।

আর বড় অর্জনগুলোর পুরস্কারও হওয়া উচিত বড়সড়। যেমন, একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স শেষ করা অথবা ব্যবসায় বড় মাপের লেনদেন হওয়া এসব অর্জনে পুরস্কারটাও হতে হবে বড় কিছু। এক্ষেত্রে রাতের বেলা পরিবারসহ আপনার পছন্দের কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া হতে পারে সবচে সেরা পুরস্কার।

মোদ্দাকথা হলো, নিজেই নিজের যত্ন নেওয়া। এটা আপনাকে আরও এগিয়ে যেতে আর অর্জনের পাল্লা ভারী করতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রতিটা কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করুন

আমরা সারা দিন ধরে একটি কাজের পেছনে লেগে থাকতে পারি না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিরতি নিতে হয়। একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না। আবার সময়সীমা নির্ধারণ করে দিলে দ্রুত কাজ করার একটি চাপ কাজ করে এবং এতে করে নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়। যদি একটি কাজ করতে আপনার সাধারণত দুই ঘণ্টা সময় লাগে, তবে সে কাজের জন্য এক ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিন। আপনি দেখে অবাক হবেন যে, কাজটি শেষ করতে সম্ভবত আপনার ৪৫ মিনিটের বেশি লাগছে না। এক্ষেত্রে নিয়ম হলো, সাধারণত যেটুকু সময় লাগে, তার অর্ধেক সময় নির্ধারিত করা।

কারণ ধরাবাঁধা সময়সীমা থাকলে আমাদের মন কাজটি দ্রুত করার জন্য পথ খুঁজতে থাকে। সময়সীমা বেঁধে দেওয়া শৃঙ্খলা মেনে চলার পথে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার দ্রুত এবং ভালোভাবে কাজ করতেও সাহায্য করে।

আপনার সময়ের 'মূল্য' কত?

সময়ের আরেক নাম অর্থ। এটা পরীক্ষিত সত্য। অপ্রয়োজনীয় কাজে নষ্ট হওয়া প্রতিটি মুহূর্ত আর কখনও ফেরত পাবেন না। অনেকে এ সমস্যার সমাধান করেন সারা দিনের প্রতিটা ঘণ্টাকে টাকার অঙ্কে মূল্যায়িত করে।

যদি আপনি মাসে ২০,০০০ টাকা কামাই করেন, তা হলে কাজের দিনগুলো টাকার অঙ্কে একেকটা দিন প্রায় ৮০০ টাকার সমতুল্য। আর যদি আপনি দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করেন তা হলে এক ঘণ্টা সমান ৮০ টাকা। তো এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করা মানে ৮০ টাকা নষ্ট করা। অবশ্য আপনি যদি সে সময়টাতে বেশি কাজ করেন, তা হলে টাকার পরিমাণটাও কিন্তু বাড়বে। কারণ, কর্মঠ লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই অলস লোকেদের চেয়ে বেশি কামাই করে। তা ছাড়া আপনার সময় যত বেশি 'দামি', সেটা অপচয় করার সম্ভাবনা তত কম। কারণ, আপনি জানেন আপনার সময় কতটা 'মূল্যবান'।

নিখুঁত হতে যাবেন না

আমি সব সময় চেয়েছি লেখক হতে। আমি এটা ভালোভাবেই জানতাম। কারণ, লেখালেখিতে আমি ভালো ছিলাম। কিন্তু আরও নিখুঁত হতে হবে, পারফেক্ট হতে হবে এই মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে শুরু করব করব করেও এগোনো হয়নি।

যখন আমি নিখুঁত হবার অপচেষ্টা বাদ দিয়ে লেখালেখি আসলেই শুরু করলাম, তখনই আমার যাত্রা সত্যিকার অর্থে আরম্ভ হলো।

আমরা নিখুঁতভাবে সবকিছু করার জন্য মাঝে মাঝে এতটাই অস্থির হয়ে থাকি যে, খুব ভালো মানের কাজকেও অবজ্ঞা করে ফেলি। আর অতিরিক্ত চাপাচাপি করে সে কাজটির মান অনেকগুণে কমিয়ে ফেলি। এর মানে এই না যে, একরকম কাজ করলেই হলো, ভালো হওয়ার দরকার নেই। না, আমাদের ফোকাস হবে কাজের মান উন্নত করা; নিখুঁত করা নয়। এ পৃথিবীর কোনো কিছুই নিখুঁত না। তাই নিখুঁত হতে চাওয়াটা আপনার জন্য আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়াবে। প্রতিটা মুহূর্তে হতাশ হয়ে পড়বেন।

সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করুন, সব সময় উন্নতি করার সুযোগ পাবেন। ভুল থেকেও শিখুন। কিন্তু অসম্ভব কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে কাজটি করে ফেলা বেশি ভালো।

আপনার সেরা সময়টা চিহ্নিত করুন

২৪ ঘণ্টা সময়ের ভেতর প্রত্যেকের একটি সময় থাকে যখন তারা সবচে ভালোভাবে কাজ করতে পারে। আপনার সময়টা বের করুন (অধিকাংশের ক্ষেত্রে এটা হয় ভোরে অথবা গভীর রাতে)। আর সে সময়টাতে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো শিডিউল করুন। এতে করে আপনি কাজটিতে খুব ভালোভাবে মনযোগ দিতে পারবেন আর কাজের মানও ভালো হবে।

আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে ফোকাস করুন

প্রতিদিন নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আজকের জন্যে আপনার সবচে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি। সে কাজটি মনযোগ দিয়ে করুন এবং পারতপক্ষে দ্রুত সেরে ফেলুন। এতে করে অন্যান্য কাজের জন্যেও সময় পাবেন আবার সবচে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ভেবে প্রশান্তিও অনুভব করবেন।

হেলথ টিপস

প্রোডাক্টিভ হবার জন্য সুস্বাস্থ্য খুব জরুরি। আপনার শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক স্বাস্থ্যের কোথাও একটু ঘাটতি হলে সেটা আপনার প্রোডাক্টিভিটি এবং কাজে প্রভাব ফেলবে। তাই প্রোডাক্টিভ থাকতে হলে নিজের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

আমাদের দেহ আল্লাহপ্রদত্ত। তাই এর যত্ন নেওয়া আবশ্যক।

নিচের টিপসগুলো আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিকভাবে ফিট থাকতে সাহায্য করবে:

প্রতিদিন কুরআন পড়ুন

কুরআন আল্লাহর সাথে আমাদের সংযোগের মাধ্যম এবং সবচে বেশি অনুপ্রেরণার উৎস। প্রতিদিন বুঝেশুনে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য সময় বের করুন। এটা আপনার আত্মিক স্বাস্থ্যের সুষমতা এবং প্রশান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। ফলে আপনার প্রোডাক্টিভিটিও সচল থাকবে।

দিনের শুরুটা হোক ফজর পড়ে

ফজরের সময়টা খুব সুন্দর এবং বরকতময়। তখন পৃথিবী নিশ্চুপ এবং স্থির আর এর বারাকাহটাও চারপাশে অনুভূত হয়। ফজর পড়ার মাধ্যমে আপনার দিনটা সঠিকভাবে শুরু হয়। ঠিক সময়ে ফজর পড়লে দেখবেন আপনি সারা দিনে অনেক কিছুই করতে পারছেন। সময়ে বারাকাহ পাওয়ার জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান

সাধারণত প্রোডাক্টিভ থাকার জন্য আমাদের গড়ে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। এর কম হলে ঝিমানো আর বেশি হলে অলসতা কাজ করবে। আবার কারো কারো খুব বেশি ঘুমানোর প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন ও সীমা ভালো করে জানে। আপনার নিজের প্রতিদিন কতটুকু ঘুম দরকার, তা বের করুন এবং তাড়াতাড়ি বিছানায় যান। আপনি সারা দিন ভালো অনুভব করবেন, বেশি সক্রিয় থাকবেন এবং অবশ্যই অনেক বেশি কাজ করতে পারবেন।

পরিমিত খান

এই বিষয়ে হাদিসের বক্তব্য বেশ স্পষ্ট। অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া অলসতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাই প্রোডাক্টিভ থাকতে হলে খাওয়া-দাওয়া পরিমিত হতে হবে। সকালে স্বাস্থ্যকর খাবার, দুপুরে আর রাতে পরিমিত খাবার খান। খাবার ফাঁকে বেশি বেশি মিষ্টি খাবার এবং পানীয় খাবেন না। অনেক বেশি পরিমাণে পানি পান করবেন। এগুলো শুনতে বেশ সহজ মনে হলেও প্রোডাক্টিভিটি বজায় রাখতে এ টিপসগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নিন

আপনার শরীর ও মন তাদের সাধ্যের ব্যাপারে অবগত। নিজের ওপর বেশি চাপ দেবেন না। ঝিমিয়ে কিংবা ক্লান্তি নিয়ে কাজ করলে কাজের মান খারাপ হবে। প্রতি

ঘণ্টায় কমপক্ষে পাঁচ মিনিটের বিশ্রাম নিন। হাত পা ছোড়াছুড়ি করুন, পানি পান করুন আর কিছুক্ষণ নিশ্বাস ছাড়ার ব্যায়াম করুন। শরীর মন চাইলে ১০-২০ মিনিটের পাওয়ার ন্যাপ নিন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করার অভ্যাস এড়িয়ে চলুন। আপনার শরীর ও মন থেকে সেরাটা পেতে চাইলে নিজেকে যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম দিতে হবে।

শান্ত থাকুন, চাপ নেবেন না

সুস্বাস্থ্যের অধিকাংশই নির্ভর করে আমরা নিজেদের কীভাবে দেখি তার ওপর। অসুস্থতা এবং আলস্যের অনেক বড় কারণ হলো দুশ্চিন্তা এবং চাপ। চাপ নিয়ন্ত্রণ বা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমি আলাদা একটি বই-ই লিখছি ইন শা আল্লাহ। যাই হোক, সংক্ষেপে বলতে গেলে, দুশ্চিন্তা করে, চাপ নিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না বরং তা আরও বাড়ে। তাই বিধ্বস্ত হয়ে না পড়ে সমাধানের প্রতি মনযোগ দিন। পৃথিবীটা এমনই আর সবার জীবনেই খারাপ দিন আসে, এটা মেনে নিন। প্রোডাক্টিভিটির পথ থেকে কোনো কিছুই যেন আপনাকে বিচ্যুত করে না দেয়। কারণ, দুশ্চিন্তা করে যে শক্তিটা আপনার নষ্ট হয় তা কখনও ফিরে পাবেন না।

মুড বুঝে কাজ করুন

সবারই ভালো দিন খারাপ দিন আছে। দিনের কোনো সময় খুব উদ্যমী থাকি আবার কোনো সময় ক্লান্ত। ভালো দিনগুলোতে স্বাভাবিক দিনের চেয়ে একটু বেশি করে কাজ করুন, যাতে খারাপ দিনগুলোতে একটু কম কাজ করলেও সমস্যা না হয়। শক্তি থাকতে থাকতে কঠিন কাজগুলো সেরে ফেলুন। শক্তি যখন কমে আসে তখনকার জন্য বিরক্তিকর কাজগুলো রেখে দিন। এভাবে ভারসাম্যও ঠিক থাকে, বার্নআউটও হতে হয় না।

প্রিয়জনদের ভালোবাসুন

পরিবারে কোনো ঝামেলা হলে কাজে মন দেওয়া বা প্রোডাক্টিভ হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুখী সুন্দর পারিবারিক সম্পর্ক আমাদের কাজে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে এবং ছেলে/মেয়ে থাকলে তাদের সময় দিন। ওই সময়ে পরিবারের সান্নিধ্যে যে ইতিবাচক আর সতেজ ভাব আপনার মনে সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অন্য কাজগুলো করতে ব্যবহার করুন। একটি সুখী পারিবারিক জীবন কর্মক্ষেত্রে আপনাকে প্রোডাক্টিভ করে তোলে। তাই সুখী পরিবার গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন।

বারাকাহ টিপস

আমরা বইয়ের শেষ দিকে চলে এসেছি। তাই ভালোভাবে টাইম ম্যানেজ করার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো:

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করুন

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ছাড়া আপনি বারাকাহ পাওয়ার আশা করতে পারেন না। পাঁচবার সালাত আদায় করাটা আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের একেবারে মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে জীবনে বারাকাহ আসার সুযোগ নেই।

বারাকাহর জন্য দু'আ করুন

সময়ে বারাকাহ পেতে চাইলে আল্লাহর কাছে সেটা চাইতে হবে। জীবনের অন্যসব চাওয়া-পাওয়ার কথা যেমন আমরা আল্লাহকেই বলি, বারাকাহর জন্যেও তেমনি আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। তাই প্রতিদিন দু'আয় আল্লাহর কাছে আপনার সময়, সম্পদ, স্বাস্থ্য, প্রচেষ্টা সবকিছুতে বারাকাহ খুঁজুন।

ভোরের প্রহরগুলো কাজে লাগান

রাতের শেষ তৃতীয়াংশ এবং ভোরের শুরুর সময়টা বারাকাহময় সময়। একদিন চেষ্টা করে দেখুন, তাহাজ্জুদের জন্য উঠুন, ফজর পড়ে আপনার কাজগুলো করা শুরু করুন। লক্ষ করে দেখবেন, কত অল্প সময়ে কত বেশি কাজ আপনি করতে পারছেন। এর সবটাই কিন্তু এ সময়গুলোতে বিরাজমান বারাকাহর কারণে হয়েছে।

উপার্জন, ব্যয়, খাবার এবং লক্ষ্যগুলো যেন হালাল হয়

দু'আ কবুল হওয়ার জন্য উপার্জন, খাদ্য এসবকিছু হালাল হওয়া আবশ্যক। সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন যেন আপনার সম্পদ উপার্জন হালাল হয়। ঠিকভাবে খরচ করুন, শুধু হালাল খাবার কিনুন আর মহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ পাবেন।

বেশি বেশি সাদাকাহ করুন

সম্পদে বারাকাহ অন্যদের পেছনে খরচ করলে। একই ব্যাপার আমাদের সময়ের ক্ষেত্রে। ভালো কাজের পেছনে সময় দিন, দেখবেন আপনার লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য অনেক সময় পাচ্ছেন। যেভাবে আপনি অন্যদের পেছনে ব্যয় করলে আল্লাহ

আপনাকে দেন, তেমনি সময়ের ক্ষেত্রেও তা-ই। অন্যদের যত সময় দেবেন, আল্লাহও আপনার সময় তত বাড়িয়ে দেবেন।

যা আছে তা নিয়ে কৃতজ্ঞ থাকুন

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> "(স্মরণ করো) যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ থাক তা হলে তোমাদেরকে আরও দেব, কিন্তু যদি অকৃতজ্ঞ হও তা হলে (মনে রাখবে) অবশ্যই আমার শাস্তি ভীষণ কঠোর'।"

এর মানে জীবন ও জীবনপোকরণের কোনো কিছুতে বৃদ্ধি আল্লাহর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই সময়ে বারাকাহ চাইতে হলে আগে আল্লাহপ্রদত্ত সময়টুকুর জন্য কৃতজ্ঞ হতে হবে। যা নেই, সে ব্যাপারে অভিযোগ করা যাবে না। সূত্রটা সহজ এবং জীবনের সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য :

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাড়ে আর অভিযোগ প্রকাশে কমে।

লক্ষ্যটাকে উঁচু করুন

আমার শেষ উপদেশ হলো, কখনও ধীর হয়ে পড়বেন না, নিজের সেরাটা হওয়ার চেষ্টায় কখনও হাল ছেড়ে দেবেন না। নিজের ঈমান, ক্যারিয়ার এবং পারিবারিক জীবন উন্নত করার যাত্রায় কখনও থমকে যাবেন না। আপনার লক্ষ্যগুলোকে অনেক ওপরে নিয়ে যান, যাতে আপনার বর্তমান অবস্থানের চেয়ে উন্নত হতে পারেন। অতীত সাফল্য যেন আপনার তৃপ্তি মিটিয়ে না দেয়।

অতীতের স্থান অতীতেই, অতীতকে বর্তমানে এগিয়ে চলার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করুন আর মন দিন বর্তমানে। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকুন। দেখবেন আপনার ঝুলিতে কল্পনাতীত অর্জন জমা হচ্ছে।

শেষ কথা : বেড়ে উঠতে থাকুন

আল-হামদু লিল্লাহ, আপনি বইটি পড়ে শেষ করেছেন। এখন আপনার সামনে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। যা শিখেছেন, তা কাজে লাগানো এবং জীবনকে প্রোডাক্টিভিটির পথে পাল্টে দেওয়া।

টাইম ম্যানেজমেন্ট আত্ম-উন্নয়নের একটি অংশ মাত্র। সৃষ্টির সেরা হওয়ার পথে আরও অনেক কিছু শেখার আছে, দেখার আছে।

টেমপ্লেট

দিন/সময়	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার
৮:০০-৯:০০					
৯:০০-১০:০০					
১০:০০-১১:০০					
১১:০০-১২:০০					
১২:০০-১৩:০০					
১৩:০০-১৪:০০					
১৪:০০-১৫:০০					
১৫:০০-১৬:০০					
১৬:০০-১৭:০০					

সাপ্তাহিক পরিকল্পনা ছক

প্রাত্যহিক কর্মতালিকা

সোমবার

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

প্রাত্যহিক কাজের মূল্যায়ন ছক

তারিখ/সময়	আমি কী করেছি	আমার কী উপকারে এসেছে	কত সময় ব্যয় করেছি	গুরুত্ব

আল্লাহ আমাদের অসীম সম্ভাবনা দিয়ে তৈরি করেছেন। এই পৃথিবীতে এবং আখিরাতে সাফল্যের জন্য যা দরকার, সবই আমাদের মাঝে বিদ্যমান। বিশ্ব ইতিহাসে মানুষ এমন সবকিছু অর্জন করেছে, যা অবাক করার মতো।

আসলে তারাও আমাদেরই মতো ছিলেন। জন্মগতভাবে সব মানুষ যে গুণাগুণ নিয়ে জন্মে তারাও তেমনই গুণাগুণ নিয়ে জন্মেছিলেন। পার্থক্য হলো তারা তাদের সময় নষ্ট করেননি এবং সব সময় নিজেদের উন্নত করার পেছনে লেগে ছিলেন। নিজেদের সেরা ভার্সনটা হওয়ার আগপর্যন্ত তারা চেষ্টা করে গেছেন। আমাদেরও সে একই প্রতিভা অন্তর্নিহিত রয়েছে তাদের মতোই।

আমরা বিনিয়োগ করা বলতেই বুঝি শুধু জায়গা-জমি কিংবা অর্থনৈতিকখাতে বিনিয়োগ করা। কিন্তু আমরা সবচে বেশি বিনিয়োগ করতে পারি নিজেদের ওপরই।

কিছু সময় নিজের জন্যে রাখুন। ধারাবাহিকভাবে স্কিল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকুন। পরবর্তী সময়ে এটাই আপনার সবচে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হবে।

আমি আশা করছি এ বইটি জীবনব্যাপী উন্নয়নযাত্রায় এ বইটি একটি ধাপ হিসেবে আপনার জীবনে স্থান করে নেবে। ভেবে দেখুন, যদি প্রতি মাসে একটি করে গুরুত্বপূর্ণ বই পড়েন, তবে সেটা আপনার জীবন কীভাবে পাল্টে দেবে।

বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের অবশ্যই নিজেদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে হবে। কারণ, আদতে আমরা কেউই নিখুঁত নই। আর এটাই সত্য যে কোনো মানুষই নিখুঁত হতে পারবে না। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাটুকুই দেখেন এবং সেভাবেই পুরস্কৃত করবেন।

তাই এখন আপনাওর ভ্রমণের দায়িত্ব আপনার হাতেই। নিয়মিত বেড়ে উঠতে থাকুন, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলে যান সর্বোচ্চ শিখরে। এ পথটা অসম্ভব রোমাঞ্চকর এবং এমন একটি জার্নি, যাতে বেরিয়ে কেউই আফসোস করবে না।

আল্লাহ যেন এ লেখাটুকু কবুল করেন, একে মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম বানান এবং শেষ বিচারের দিনে আমাদের ভালো কাজের 'আমালনামায় একে যুক্ত করে দেন। আল্লাহ যেন আমাদের সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার মতো শক্তি দেন এবং এ উম্মাহকে সাহায্য করা, এ পৃথিবীকে আরও সুন্দর করার সামর্থ্য আমাদের দান করেন।

আপনার সময়ের জন্য জাযাকাল্লাহু খায়র। আশা করছি, আমি যেমন এ লেখাটা উপভোগ করেছি, আপনারাও এর পাঠ উপভোগ করেছেন।

ওয়াস-সালাম

আপনাদের ভাই

আবু মুআবিয়া ইসমাইল কামদার।

পরিশিষ্ট ১

খারাপ দিনগুলোতে টাইম ম্যানেজমেন্ট

পাখিদের কিচিরমিচিরে ভরপুর একটি আলো ঝলমলে দিনে আপনার মন-মেজাজ থাকে বেশ ফুরফুরে। এমন দিনে আপনি যথেষ্ট উদ্যম আর প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে কাজ করতে পারেন। কারণ, দিনটি আপনার, সবকিছুই থাকে আপনার অনুকূলে। অবশ্য সেটা এখন আলোচ্য নয়।

আপনার দিনে সব কাজ সময়মতো ঠিকঠাকভাবে করে ফেলাটা আসলে তেমন কোনো ব্যাপার না। আসল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটি বাজে দিনেও কীভাবে সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলা যায়। এটা নিয়েই আমরা এখন কথা বলব।

ভীষণ মন খারাপের দিনে ইচ্ছে করে—ঘরদোর বন্ধ করে সব আলো নিভিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে কিংবা নথি-পত্র সবকিছু ছিঁড়ে-ছুড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠতে। এমন দিনে কি আর কাজকর্ম কিছু হয়? কিন্তু এই ৫টি পরামর্শ মেনে চললে এরকম একটি দিনকেও আপনার করে নিতে পারবেন।

দিনের সবচে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি খুঁজে বের করুন এবং সেটি করে ফেলুন

ধরুন, আজ আপনার চন্দ্র-বিজয়ের দিন। কিন্তু সকালে রাগান্বিত ও খিটখিটে মেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠলে আজকে চন্দ্র-বিজয় করা, একটি বেস্ট-সেলিং উপন্যাস লেখা, যুদ্ধরত দুটি দেশের মাঝে মধ্যস্থতা করা কিংবা কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ বাঁচানো—এরকম বড় কোনো কাজ করাই আপনার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এই বড়সড় কাজগুলো সবচে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনেও করে ফেলা সম্ভব।

অন্যান্য দিনের চেয়ে একটি বিষণ্ণ দিনে ঢের কম কাজ করতে পারবেন। তাই সবচে ভালো হয়, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রথমেই করে ফেলা। আপনার টু-ডু লিস্টে তাকান। এমন তিনটি কাজ খুঁজে বের করুন, যেগুলো সন্ধ্যার মাঝে করে ফেলতে পারলে আপনি নিশ্চিন্ত বোধ করবেন। এবার সেই তিনটি কাজ করে ফেলুন। আপনি

সেদিন আর কোনো কাজ করতে না পারলেও সন্ধ্যায় ফুরফুরে মেজাজে থাকবেন, আয়েশ করে কফি খেতে পারবেন।

কিছু ডাউনটাইম নির্ধারণ করুন

শরীর ক্লান্ত ও দুর্বল লাগলে বুঝে নিন আজ একটুখানি রিল্যাক্স দরকার, শরীরটাকে একটু রিচার্জ করে নেওয়া দরকার। শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দিন। নিজের জন্য এমন কিছু সময় বের করুন, যখন আপনি কোনো কাজ করবেন না। এ সময়টাতে মজার কোনো বই পড়ুন কিংবা সবচে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে পছন্দের কোনো জায়গায় ছোট একটি কফি-ব্রেক নিয়ে আসুন অথবা চোখ বন্ধ করে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে থাকুন। রিল্যাক্স করার সময় অপরাধবোধে ভুগবেন না। আপনি সময় অপচয় করছেন না কিংবা আনপ্রোডাক্টিভ থাকছেন না, আপনি বরং কম সময়ে বেশি কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছেন।

কাজের চাপ কমিয়ে ফেলুন

সামনের সপ্তাহে বিশাল কাজের চাপের দুশ্চিন্তা আপনাকে পেয়ে বসলে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কাজ করার পাশাপাশি বাকি কাজগুলোকে অর্ধেক করে ফেলুন। ধরুন, আপনি সাধারণত দিনে ৮ পৃষ্ঠা করে লিখেন, এরকম দিনে ৪ পৃষ্ঠা লেখার পরিকল্পনা করুন। যদি দিনে ১০টি পণ্য বিক্রি করে থাকেন, আজকে মাত্র ৫টি বিক্রি করার টার্গেট করুন। এ পরিস্থিতিতে অনেকে চুপচাপ বসে থাকে, কোনো কাজ করে না। তার পুরো দিনটিই মাটি হয়ে যায়। কম কাজ করার পরিকল্পনাটি আসলে আপনাকে এমন একটি দিনেও কিছু কাজ করতে সাহায্য করছে। এমন দিনে অর্ধেক কাজ করার টার্গেট করে অপরাধবোধে ভুগবেন না। আপনি যেহেতু খারাপ মুডে আছেন, তাই একেবারে কিছু না করার চেয়ে অর্ধেক কাজ করা অনেক ভালো।

বিরক্তিকর লোকদেরকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন

ধরুন, এমন কারো সাথে আপনার মিটিং আছে, যার সাথে ডিল করা কঠিন, আর এদিকে আপনার মুড অফ। মিটিংটি রি-শিডিউল করুন। হয়তো সবকিছু গুছিয়ে এনেছেন, এখন নিশ্চয় বাজে একটি পরিস্থিতিতে পড়ে ডিলটি হাতছাড়া করতে চাইবেন না। সবচে ভালো হয় এরকম দিনে অফিস বন্ধ করে একা একা কাজ করলে। অন্যরাও আপনার মেজাজ থেকে নিরাপদ থাকবে।

বেশি বেশি অনুপ্রেরণা নিন

আপনি যদি আমার মতো হন, তা হলে হয়তো আপনার পিসিভর্তি অনুপ্রেরণামূলক উক্তি, ছবি, অডিও, ভিডিও আছে। আজ যদি আপনার দিনটি খারাপ যায়, হয়তো

আপনার পুরো কালেকশনটিরই প্রয়োজন হবে। আপনার কালেকশন থেকে উক্তিগুলো পড়ুন, ভিডিওগুলো দেখুন, যেই ছবিগুলোতে আপনার লক্ষ্যের কথা লেখা আছে সেগুলো দেখুন। দিনটি কত খারাপ গিয়েছে সেটা নিয়ে চিন্তা না করে নতুনভাবে কাজ করার জন্য নিজের ভেতরে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলুন। আমি যখন হতাশ হয়ে পড়ি তখন কিছু সময় কুরআন পড়ি এবং আয়াতগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা করি। এটি আমার বিক্ষিপ্ত মনকে প্রশান্ত করে এবং হতাশা কাটিয়ে আশা জাগ্রত করে। আপনাদেরও এটি চেষ্টা করে দেখা উচিত।

এই ৫টি পরামর্শ মেনে চলুন, আমি নিশ্চিত যে আপনার বিরক্তিকর দিনটি প্রোডাক্টিভ হয়ে উঠবে। আপনার অন্যান্য সাধারণ দিনগুলোর মতো না হলেও আপনি যথেষ্ট কর্মক্ষম থাকতে পারবেন।

*লেখাটি এরকম কোনো দিনেই লেখা হয়েছে।

(মূল লেখাটি ১৮ মে, ২০১৫ তারিখে https://www.islamicselfhelp.com/2015/05/18/time-management-for-bad-days/ ব্লগসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল।)

পরিশিষ্ট ২

রামাদানে টাইম ম্যানেজমেন্ট

বছরের সেরা মাস রামাদান। কিন্তু কীভাবে রামাদানের সব কাজ ঠিকঠাকভাবে সময়মতো করবেন, সেটা নিয়ে ভেবেছেন কি? কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক—রামাদানে টাইম ম্যানেজমেন্টের উপায়।

আগেভাগেই পরিকল্পনা করুন

টাইম ম্যানেজমেন্ট দুটো ভাগে বিভক্ত—পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন। সুন্দর একটি পরিকল্পনা না থাকলে দেখতে দেখতেই আপনার রামাদান চলে যাবে, খুব বেশি কিছু করা হবে না। সামনের রামাদানটিকে এভাবে চলে যেতে দেবেন না। হাতে কয়েক সপ্তাহ সময় থাকতে থাকতেই রামাদানকেন্দ্রিক পরিকল্পনা সাজিয়ে নিই।

প্রথমেই রামাদানের উদ্দেশ্য আপনার কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে। কুরআন বলছে,

> "সাওম আমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে, যাতে আমরা তাকওয়াবান (আল্লাহভীরু) হতে পারি। আর মানবজাতির হিদায়াতের জন্য এই রামাদান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"
>
> (সূরা বাকারা: ১৮৩, ১৮৫)

অর্থাৎ রামাদানের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের হিদায়াত ও তাকওয়া বৃদ্ধি করা। আপনার সকল লক্ষ্য এই দুটো বিষয়কে সামনে রেখেই নির্ধারণ করতে হবে। কি, লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন তো? ব্যস, আমরা এবার পরের ধাপে যেতে পারি।

প্রতিদিনের 'ইবাদাহ টাইম' হিসেব করে ফেলুন

সাধারণত আমরা চিন্তা করে থাকি পুরো রামাদান জুড়ে দিনে ২৪ ঘণ্টাই 'ইবাদাহ করে কাটাব। এই চিন্তাটি একেবারেই বাস্তবসম্মত নয়। প্রতিদিন আমাদের অন্যান্য

কাজেও সময় দিতে হয়। রামাদানের মাঝামাঝিতে এসে আমাদের আগ্রহ উদ্দীপনা কমে যেতে থাকে। চাকরি কিংবা ব্যবসা, পরিবারের দায়িত্ব এবং অন্যান্য কাজের ব্যস্ততায় 'ইবাদাহ করার সময় পাওয়া যায় না। দেখা যায় আপনি শুরুতে যতটুকু 'ইবাদাহ করার কথা ভেবেছিলেন, তার চেয়ে অনেক কম 'ইবাদাহ হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি এড়াতে প্রথমেই হিসেব করে ফেলুন প্রতিদিন 'ইবাদাহ'র জন্য আপনি কতটুকু সময় পাবেন। তারপর টার্গেট করুন প্রতিদিন কমপক্ষে ততটুকু সময় অবশ্যই 'ইবাদাহ করবেন। হিসেবটা একদমই সোজা: ২৪ ঘণ্টা-(ঘুমানো, প্রাতিষ্ঠানিক কাজ এবং পারিবারিক কাজের সময়) = 'ইবাদাহ টাইম।

ধরুন, আপনি প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা ঘুমান, আট ঘণ্টা জব করেন, ছেলেমেয়েকে কমপক্ষে এক ঘণ্টা হোমওয়ার্ক করায় সাহায্য করেন। সাথে সাহরী-ইফতার ও রাতের খাবারের সময়, খাবারের পর বিশ্রামের সময় এবং ট্রাফিক জ্যামে নষ্ট হওয়া সময় যোগ করুন। এভাবে হিসেব করলে দেখা যায় গড়ে আপনার হাতে আরও চার থেকে ছয় ঘণ্টা সময় থাকে। (মজার ব্যাপার হচ্ছে রামাদান ছাড়া অন্যান্য মাসেও মোটামুটি একই সময় বেঁচে যায়। কিন্তু রামাদানের বাইরে আমরা এই 'ইবাদাতগুলো করতে পারি না কেন?

যেহেতু খাবার তৈরি করা, আত্মীয়স্বজনকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি দায়িত্বও অনেকের থাকে, তাই আমরা আমাদের লক্ষ্যটি আরেকটু ছোট করে নির্ধারণ করি। সেটি হচ্ছে প্রতিদিন মাত্র তিন ঘণ্টা 'ইবাদাহ করা। রামাদানের প্রতিদিনের জন্য তিন ঘণ্টা 'ইবাদাহ টাইম' বের করতে পারলে সেটিই অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলার জন্য যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে রামাদানের ২৯ দিনে আপনি সব মিলিয়ে ৮৭ ঘণ্টা 'ইবাদাহ করতে পারবেন। এক মাসে এই অতিরিক্ত ৮৭ ঘণ্টার 'ইবাদাহ আপনার জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে, অকল্পনীয় তাকওয়া বৃদ্ধি করতে পারে।

তার মানে যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত, এক ঘণ্টা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা এবং এক ঘণ্টা দু'আ ও যিকির করার পরিকল্পনা করেন আর মাসব্যাপী সেটা করতে পারেন, তা হলে আসলেই অনেক কিছু করে ফেলবেন। তিন নম্বর পয়েন্টে ব্যাপারটি আরও খোলাসা করা হয়েছে।

স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

আপনি ইতোমধ্যেই জেনে গেছেন রামাদানের সামগ্রিক উদ্দেশ্য কী এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে প্রতিদিন কতটুকু 'ইবাদাত করবেন সেটিও হিসেব করে ফেলেছেন। পরের ধাপ হচ্ছে S.M.A.R.T লক্ষ্য নির্ধারণ করা। অর্থাৎ, আপনার লক্ষ্যগুলো হতে

হবে specific (সুনির্দিষ্ট), measurable (গণনাযোগ্য), attainable (অর্জনযোগ্য), realistic (বাস্তবসম্মত), time-bound (সময়-নির্ধারিত)। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

একটি S.M.A.R.T লক্ষ্য এমন হতে পারে—আমি রামাদানে এই ৮০০ পৃষ্ঠার তাফসীরটি পড়ে শেষ করব। ২৯ দিনে ৮০০ পৃষ্ঠা শেষ করতে হলে আমাকে প্রতিদিন গড়ে ২৮ পৃষ্ঠা পড়তে হবে। এবার দেখা যাক লক্ষ্যটি কতটুকু S.M.A.R.T!

Specific (সুনির্দিষ্ট)

আমি নির্দিষ্ট একটি তাফসীর পড়তে চেয়েছি।

Measurable (গণনাযোগ্য)

কত পৃষ্ঠা পড়া হয়েছে, এটি সহজেই হিসেব করা যায়।

Attainable (অর্জনযোগ্য)

প্রতিদিন এক ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে পড়লে সহজেই ২৮ পৃষ্ঠা পড়ে ফেলা যায়।

Realistic (বাস্তবসম্মত)

তাফসীরটি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যই লেখা হয়েছে। তাই পড়তে গিয়ে দাঁত ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই!

Time-bound (সময়-নির্ধারিত) :

যেহেতু রামাদানের সময় নির্ধারিত, তাই এই শর্তটি স্বভাবতই পূরণ হয়।

প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য সময় নির্ধারণ করুন

রামাদানের জন্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন এবং প্রতিদিন 'ইবাদাতের জন্য কতটুকু সময় রয়েছে, তাও জেনেছেন। এখন প্রয়োজন প্রতিটি লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা। ধরুন, আপনার লক্ষ্য প্রতিদিন ৩০ পৃষ্ঠা তাফসীর অধ্যয়ন করা এবং এটি করতে আপনার ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। এখন আপনার যদি তারাওয়ীর পূর্বে প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় ফ্রি থাকে, তা হলে সে সময়টুকু তাফসীর অধ্যয়নের জন্য নির্ধারণ করুন।

প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাহগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন। অর্থাৎ, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় কুরআন তিলাওয়াতের জন্য (হতে পারে ফজরের আগে কিংবা পরে), আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দু'আ করার জন্য কিছু সময় (ইফতারের আগে), পারিবারিক দীনি বৈঠকের জন্য কিছু সময় (হতে পারে আসর কিংবা তারাওয়ীর পর) এবং আপনার অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করুন। যত দূর সম্ভব সময়গুলো সুনির্দিষ্ট করুন এবং সেটি কড়াকড়িভাবে মেনে চলুন।

যেহেতু সবকিছুই আপনার নিয়ন্ত্রণে না, তাই কিছু কিছু দিন আপনি পুরোপুরি সময়সূচি ঠিক রাখতে পারবেন না। কিন্তু একটি রুটিন থাকলে এরকম দিনেও কাজগুলো করে ফেলার জন্য সময় বের করে নিতে পারবেন। হঠাৎ কোনো দিন ব্যস্ত হয়ে পড়লে ওই দিনের নির্ধারিত টার্গেট অর্ধেক করে ফেলুন। একেবারে বাদ দিয়ে দেবেন না। দিনে একটুও তাফসীর না পড়ার বদলে আধা ঘণ্টা কিংবা বিশ মিনিট হলেও পড়ুন। এভাবে আপনার ব্যস্ততম দিনেও আপনি ট্র্যাকে থাকতে পারবেন।

সকালের সময়টি কাজে লাগান

সকালের সময়টি হতে পারে সাহরীর আগে কিংবা পরে। সেটি নির্ভর করছে রামাদান গ্রীষ্মকালে হচ্ছে না শীতকালে হচ্ছে তার ওপর। গরমের সময় সাহরী বেশ আগেভাগে হয়, তাই অনেকেই সাহরীর আগে উঠতে পারেন না। সেক্ষেত্রে ফজরের পরে ঘণ্টাখানেক ‘ইবাদাহ করার পরামর্শ থাকবে।

শীতের সময় সাহরী হয় দেরিতে, ঘুম থেকেও তাড়াতাড়ি ওঠা যায়। এরকম সময়ে এক ঘণ্টা কিংবা কমপক্ষে আধা ঘণ্টা আগে উঠুন। এ সময়টুকু কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ), দু'আ ও কুরআন তিলাওয়াত করে কাটান।

আমি রাতের শেষভাগ ও ভোরের সময়টুকুতে জোর দিচ্ছি দুটো কারণে। প্রথমত সময়টি বারাকাহপূর্ণ থাকে, দ্বিতীয়ত এ সময়ে অন্য কোন কাজ থাকে না। ফলে এটি বেশি বেশি ‘ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময়।

পারিবারিক দীনি বৈঠকের জন্য সময় নির্ধারণ করুন

আপনার পরিবারে এই চর্চাটি না থাকলে এ বছরই শুরু করুন। পরিবারের সদস্যদের মাঝে বন্ধন মজবুত করা এবং সবাইকে নিয়ে ঈমানের পথে এগিয়ে চলার শ্রেষ্ঠ সময় রামাদান। এ সময় শয়তান থাকে বন্দি, সবার মাঝে থাকে ধর্মীয় বোধ। এই ধর্মীয় আবেগটুকু পরিচর্যা করা দরকার, যাতে করে এটা থেকে রামাদানের পরেও আমরা উপকার পেতে পারি। পরিবারে দীনি বৈঠকের প্রচলনের মাধ্যমে এটা পাওয়া সম্ভব।

বৈঠকের সময়টি হতে পারে ইফতারের আগে কিংবা তারাওয়ীহ'র পরে। সেখানে কোনো ইসলামি বই থেকে এক পাতা পড়ে কিংবা একটি লেকচার থেকে কিছু অংশ শুনে সেটি নিয়ে সবাই মিলে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনায় প্রতিটি সদস্যকে অংশগ্রহণ করতে বলুন। এটি পরিবারের ছোট সদস্যদেরকে গভীরভাবে ভাবতে শেখাবে, তাদেরকে চিন্তাশীল ও প্র্যাকটিসিং মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবে। দীনি বৈঠকের চর্চাটি রামাদানের পরেও অব্যাহত রাখুন।

প্রতিদিন কুরআনের পেছনে সময় দিন

কুরআনের মাস রামাদানে প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করা উচিত। আমাদের দেশে রামাদানে দ্রুত কুরআন পড়ে কে কত বেশি খতম করতে পারে, তার একটি প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এমনটি করার পরিবর্তে ধীরে সুস্থে তিলাওয়াত করা, অর্থ বোঝা, তাফসীর অধ্যয়ন করার দিকে মনোযোগ দিন। এটি আপনার জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।

মাল্টিটাস্কিং পরিহার করুন

রামাদানের বাইরেও এই পরামর্শটি মেনে চলুন। মাল্টিটাস্কিং নিয়ে এখানে আমি যা বলতে চাই তা হলো:

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাল্টিটাস্কিং কর্মদক্ষতা ও কাজে মনোযোগ কমিয়ে দেয়। একইসঙ্গে একাধিক কাজ করলে আমাদের মস্তিষ্ক কোনো কাজেই পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারে না। ফলে কোনো কাজই যথাযথ হয় না। আধুনিক টাইম ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, একই সময়ে একাধিক কাজ না করে একটি কাজ করলে দ্রুত ও মানসম্মত হয়। কারো সাথে কথা বলার সময় হাতের কাজটি বন্ধ রেখে তার দিকে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিন। কোনো বই বা আর্টিকেল লেখার সময় অন্য সকল কাজ বন্ধ করে লেখার দিকে মনোনিবেশ করুন। কোনো মিটিংয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় শুধু প্রস্তুতি নেওয়ার দিকেই নজর দিন।

এভাবে কাজ করলে দেখবেন আপনার কাজ স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হবে, পাশাপশি কাজগুলো মানসম্মত হবে। মাল্টিটাস্কিং-এ অতিরিক্ত যে কাজগুলো করতে চেয়েছিলেন, সেগুলো করার জন্য এখন যথেষ্ট সময় পাবেন।

রামাদানের প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময় নিয়ে যথাযথ মনোযোগের সাথে 'ইবাদাত করুন। ফেইসবুক বা নেট ব্রাউজিং করার সময় কিংবা বাচ্চার যত্ন নেওয়ার সময় কুরআন তিলাওয়াত করবেন না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় পরিপূর্ণ মনোযোগ না দিলে কখনো এর থেকে উপকৃত হতে পারবেন না। একই কথা তাফসীর অধ্যয়ন কিংবা দু'আ করার ব্যাপারেও প্রযোজ্য। যেকোনো 'ইবাদাতের জন্য এমন স্থান, সময় ও পরিবেশ নির্ধারণ করুন, যেখানে আপনার সামান্য ঝিমুনিও আসবে না, অখণ্ড মনোযোগের সাথে 'ইবাদাহ করতে পারবেন। এ কারণেই আমি সকালের প্রথম ভাগে 'ইবাদাহ করার পরামর্শ দিই, কারণ এ সময়ে মানুষের ব্যস্ততা কম থাকে এবং মন-মেজাজ শান্ত থাকে।

অতিরিক্ত সামাজিক যোগাযোগ পরিহার করুন

অনলাইন অফলাইন দু-ধরনের সামাজিক যোগাযোগই কমিয়ে ফেলুন। রামাদানের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ ইতিকাফ। ইতিকাফের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক জীবন থেকে ছুটি নিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা। যদি ইতিকাফ না-ও করতে পারেন, সামাজিক কর্মকাণ্ড কমিয়ে 'ইবাদাতে বেশি সময় আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমেও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন। ইফতার পার্টিতে কম অংশগ্রহণ করুন, ফেইসবুক টুইটারে অল্প সময় দিন এবং অপ্রয়োজনীয় আড্ডা থেকে বিরত থাকুন। এর মাধ্যমে আল্লাহর 'ইবাদাতের জন্য আরও বেশি সময় পাবেন।

স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখুন

ক্লান্তি, দুর্বলতা, নিদ্রাহীনতা আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছুতে দেবে না। অনেকেই রামাদানের প্রথম কয়েক দিন খুবই অতিরিক্ত মাত্রায় 'ইবাদাহ করেন। ফলে দেখা যায় রামাদানের বাকি দিনগুলোতে 'ইবাদাহ'র জন্য তার ইচ্ছে ও শক্তি কোনোটিই থাকে না। আপনার রামাদানটি যেন এমন না হয়। মানসিকভাবে উজ্জীবিত থাকুন, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকুন। পর্যাপ্ত ঘুম, প্রয়োজনমাফিক স্বাস্থ্যকর খাবার ও প্রচুর পানীয় গ্রহণ করুন। একজন স্বাভাবিক মানুষের রাতে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। আপনার সে রকম ঘুম হচ্ছে কিনা নিশ্চিত করুন, দরকার হলে একটু আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়ুন। সাহরী ও ইফতারে বেশি মিষ্টি ও তৈলাক্ত খাবার বাদ দিয়ে সুষম খাদ্য খান। খোঁজখবর নিয়ে দেখুন কোন কোন খাবার পুষ্টিমান সমৃদ্ধ এবং বেশি শক্তি সরবরাহ করে। রাতে ঘুমানোর আগে বেশি করে পানি পান করুন, এটি আপনার সারা দিনের পানির চাহিদা পূরণ করবে।

(মূল লেখাটি https://www.islamicselfhelp.com/2015/05/10/10-time-management-tips-for-ramadan/ ব্লগসাইটে ৫ মে, ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।)

পরিশিষ্ট ৩

ব্যর্থতা এড়ানোর পাঁচটি উপায়

লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়াটা উন্নতিরই অংশ। কথায় আছে, 'কখনও ব্যর্থ না হওয়া মানে কখনও নতুন কিছু করার চেষ্টা না করা'। লক্ষ্যপূরণের প্রসঙ্গে আমরা দুটি প্রান্তিকতার শিকার:

- ১. ব্যর্থ হব এই ভয়ে চেষ্টাই না করা।
- ২. সাফল্যের ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত হয়ে পড়া যে, ব্যর্থতার মুখোমুখি হলেই সাথে সাথে হাল ছেড়ে দেওয়া।

ব্যর্থতার ভয় এই টপিকে আমি আমার অন্য একটি বই (Best of Creation : An Islamic Guide to Self-confidence)-এ আলোচনা করেছি। এই লেখায় আমি সরাসরি ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করব, ব্যর্থতা যখন আমাদের আক্রান্ত করে তখন আমাদের কী করণীয়, তা-ই আমাদের আলোচ্য ।

মেনে নিন, এটা ঘটবেই

কোনো প্রকার বাধা কিংবা পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া ছাড়াই আমরা আমাদের সব লক্ষ্য অর্জন করে ফেলব, এমনটা ভাবা খুবই বোকামো হবে। পরীক্ষা আর বাধা আমাদের জীবনের স্বাভাবিক পরিক্রমার অংশ, তাই ধরে রাখুন বাধা আসবেই। আপনার কাজ অগ্রিম পরিকল্পনা সাজিয়ে রাখা আর বাধাগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবিলা করা। পার্থিব বা আত্মিক সব লক্ষ্যেই আমরা অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হব। কিন্তু বিবেচ্য হলো এই কঠিন মুহূর্তগুলোতে আমরা কেমন ছিলাম। আর এ মুহূর্তগুলোই আমাদের প্রকৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করে।

ধরে নিন যে কাজটি ঠিকঠাক মতো হবে না, ভুল হবে। এরপর ব্যর্থতা এলে যেভাবে মুখোমুখি হবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন, সেভাবে ব্যর্থতাকে মোকাবিলা

করুন। তারপরও যদি পরিকল্পনা কাজ না করে, তবু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। ধরে নিন এতেই আল্লাহ আপনার ভালো রেখেছেন। এভাবে আপনার জন্য সব পরিস্থিতিতে আপনিই হবেন বিজয়ী।

ভাগ্যকে মেনে নিন

তাকদীর এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে সবার মধ্যেই প্রচুর ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। একদিকে বাড়াবাড়ি, আরেকদিকে ছাড়াছাড়ি। ইসলাম শেখায় মধ্যপন্থা। কিন্তু তাকদীর নিয়ে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে যাব না।

আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়টুকুই শুধু এখানে বলছি। কোনো কিছুর ব্যাপারে পরিকল্পনা করার পর চেষ্টা করুন পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে। নিজের সর্বোচ্চটা দিন। তবু যদি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন, তা হলে হতাশ বা ক্ষুব্ধ হবেন না। এমন অনেক কিছুই আছে, যার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ যা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তা-ই আমাদের জন্য সর্বোত্তম।

আপনার লক্ষ্য সৎ হলে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকুন। যখন সঠিক সময় আসবে আল্লাহ সেটা পাওয়ার দরজা আপনার জন্য খুলে দেবেন। আল্লাহ জানেন আমাদের জন্য কোনটা ভালো, এ কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং তাকদীরকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে আমরা আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করি। আর তখন পৃথিবীর ছোটখাটো ব্যর্থতা আর আমাদের খুব একটি হতাশ করতে পারে না।

প্ল্যান B,C,D,E তৈরি রাখুন

প্রথমবারেই লক্ষ্য পূরণে সফল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই বর্তমান পরিকল্পনা যতই চৌকস মনে হোক, বিকল্প পরিকল্পনাও হাতে রাখুন। কারণ, প্রতিবার সময় আপনার পক্ষে থাকবে না। বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করার সময় মাথায় রাখুন কীভাবে কীভাবে আপনার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। এরপর সে ফাঁকা জায়গাগুলোকে বন্ধ করে দেয় এমনভাবে পরিকল্পনা সাজান। এটা করার পর আরেকটা বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করুন, এরপর আরেকটা। যাতে করে কোনো একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও আপনি অন্য পথে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন।

রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবিরা মাদীনা থেকে মাক্কায় উমরাহ পালন করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মাক্কা প্রবেশে তাঁদের বাধা দেওয়া হলো। এরপর এলো প্ল্যান B, মাক্কার নেতাদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা। চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা আগামী বছর উমরাহ পালন করতে পারবেন। উমরাহ পালনের লক্ষ্য পূরণ হতে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে তবু অন্তত লক্ষ্যটা পূরণ হবে। এছাড়া সে চুক্তিতে তাঁরা আরও অনেক

কিছু অর্জন করেছিলেন। বাধার সম্মুখীন হয়ে তাঁরা হাল ছেড়ে দেননি বরং লক্ষ্য পূরণের জন্য ভিন্ন একটি উপায় বেছে নিয়েছিলেন।

সবর ফ্যাক্টর : সামনে এগিয়ে চলুন

উহুদের ঘটনা ভেবে দেখুন। নবিজি ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা উহুদে এক বিশাল বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তাদের অসংখ্য কাছের মানুষদের হারিয়েছিলেন। তবু তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েননি কিংবা হাল ছেড়ে দেননি। মারাত্মকভাবে আহত হয়েও পরের দিনই তাঁরা সম্মুখ সমরে উপস্থিত হলেন। যখন কোনো কিছুই তাদের পক্ষে যাচ্ছিল না তখনও তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। আর তাদের সাফল্যের পেছনে এটা অনেক বড় একটি কারণ।

এটাই হলো সবর ফ্যাক্টর। সবর কোনো জাদু না যে, বসে বসে দেখবেন আর রহস্যজনকভাবে সাহায্য এসে পড়বে। সবর হলো অধ্যবসায়, ধৈর্য ধরে পরিকল্পনা করা, হাল ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা রোধ করে সব বাধার মুখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নাম। কিছু অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই সবর করা শিখতে হবে। সবর ছাড়া সাফল্যের আর কোনো শর্টকাট নেই। দুনিয়াতেও না, আখিরাতেও না। প্রতিটা লক্ষ্য পূরণের জন্য অনেক অনেক বালতি সবর লাগবে, তাই আপনিও সংগ্রহ করে নিন।

নমনীয় হোন

লক্ষ্য অর্জনের পথে চলার সময় আরও ভালো লক্ষ্যের খোঁজও করতে থাকুন। সে সাথে লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য বিকল্পও খুঁজে রাখুন। ২০ বছর বয়সে যে লক্ষ্য আপনার ছিল হয়তো সারা জীবন সে লক্ষ্যের সাথে আপনি লেগে থাকবেন না। ওই লক্ষ্য পূরণের পথে আপনার সামনে আরও ভালো কোনো লক্ষ্য অর্জনের হাতছানি এলে ফোকাস সরানোর মতো নমনীয় হোন। সম্ভবত আগের লক্ষ্যটা ছিল এই লক্ষ্য পূরণের পথে একটি সিঁড়ি মাত্র।

ইসলামের শুরুর দিনগুলোতে অনেক সাহাবি আবিসিনিয়া চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। অনেক বছর পর তাদের অনেকেই মাদীনা চলে এলেন। কারণ, মাদীনায় ইসলাম পালন করা এবং ইসলামের সেবা করার আরও ভালো পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। একইভাবে এখন আপনার স্বপ্ন হয়তো কোনো একটি পেশা কিংবা কোনো একটি দেশে চলে যাওয়া। তবু পরবর্তী সময়ে জীবনে আরও ভালো কোনো সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে। ফোকাসটা তখন সরিয়ে নেওয়ার মতো মানসিকতা গড়ে তুলুন। কারণ, জীবন পরিবর্তনের সাথে সাথে এগিয়ে চলে। তাই অতীতে পড়ে থাকবেন না। খুঁজে দেখুন আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কোনটা ভালো হবে।

লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে হোঁচট খেলে এই পাঁচটা টিপস আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আশা করছি আপনারাও অনুপ্রাণিত হবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-বুখারি, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল, সহীহ আল-বুখারি, আরবি, (করাচি : ক্বাদিমি কুতুবখানা)।

আলী, আবদুল্লাহ ইউসুফ, ১৯৯৩, দা হলি কুরআন : অনুবাদ ও টীকা, (ডারবান : আইপিসিআই)।

অ্যালেন, ডেভিড, ২০০৩, গেটিং থিংস ডান, (ইউএসএ : পেঙ্গুইন)।

বেইগ, মীর্জা ইয়াওয়ার, (ডারবান : ব্রীজ পাবলিশিং)।

----, ২০১৩, অ্যান অন্ট্রাপ্রেনিওরস ডায়রি, (ডারবান : ব্রীজ পাবলিশিং)।

----, ২০১১, হায়ারিং উইনারস, (ডারবান : ব্রীজ পাবলিশিং)।

----, ২০১২, লিডারশীপ লেসনস ফ্রম দা লাইফ অফ রাসূলুল্লাহ।

ক্যানফিল্ড, জ্যাক, ২০১১, দা পাওয়ার অফ ফোকাস, (ডিয়ারফিল্ড বীচ : হেলথ কম্যুনিকেশনস, ইনক.)।

কার্লসন, রিচার্ড, ১৯৯৮, ডোন্ট সোয়েট দা স্মল স্টাফ, (লন্ডন : হড্ডার মবিয়াস)।

কার্নেগি, ডেল, ২০০৬, হাউ টু উইন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপল, (লন্ডন :ভার্মিলিন)

কভেই, স্টিফেন, ২০০৪, দা সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল, (সাইমন অ্যান্ড শুস্টার)।

ফেরিস, টিমথি, ২০১১, দা ফোর আওয়ার ওয়ার্ক উইক, (লন্ডন :ভার্মিলন)

গুদ্দাহ, আবদুল ফাত্তাহ আবু, দা ভ্যালু অফ টাইম, nmusba.wordpress.com.

গোল্ডস্মিথ, বেটন, ২০১০, হান্ড্রেড ওয়েইস টু বুস্ট ইওর সেল্ফ কনফিডেন্স, (ইউএসএ : ক্যারিয়ার প্রেস)।

হাবিব, সায়েদা, ২০১৪, ডিসকভার দা বেস্ট ইন ইউ! লাইফ-কোচিং ফর মুসলিমস, (লিস্টারশায়ার :কিউব পাবলিশিং)।

ইবনু আল-হাজ্জাজ, মুসলিম, সহীহ মুসলিম, আরবি, করাচি (ক্বাদিমি কুতুবখানা)

ইবনু জাউযি, আব্দুর রহমান, ২০০৯, টাইম ইজ ভ্যালুয়েবল, করাচি, দারুল-ইশাত।

কামদার, আবু মুআউইয়াহ ইসমাইল, ২০১৫, বেস্ট অফ ক্রিয়েশন : অ্যান ইসলামিক গাইড টু সেল্ফ কনফিডেন্স, প্যাট্রিজ আফ্রিকা।

---- ২০১১, হ্যাভিং ফান দা হালাল ওয়ে : এন্টারটেইনমেন্ট ইন ইসলাম, (রিয়াদ : আইআইপিএইচ)।

কাছির, আল-হাফিজ ইসমাইল ইবন, ২০০৫, তাফসির ইবন কাসির, (ইংরেজি অনুবাদ), (মাদিনা: দারুস সালাম)।

খান, ড: মুহাম্মাদ মুহসিন অ্যান্ড ড: মুহাম্মাদ তাকিউদ্দিন আল-হিলালী, ১৯৯৬, দা ট্রান্সলেশন অফ দা নোবেল কুরআন, (রিয়াদ: দারুস সালাম)

কচ, রিচার্ড, ২০০৩, দা ৮০/২০ ইনডিভিজুয়াল, লন্ডন: নিকোলাস ব্রিলেই পাবলিশিং)।

মালিক, মুহাম্মাদ ফারুক-ই-আজম, ২০০৬, আল-কুরআন: গাইডেন্স ফর ম্যানকাইন্ড, হিউস্টন, (টেক্সাস: ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক নোলেজ)।

পেরি, জন, ২০১২, দা আর্ট অফ প্রোকাস্টিনেশন, (নিউ ইয়র্ক: ওয়ার্কম্যান পাবলিশিং)।

প্রিস্টন, ডেভিড লরেন্স, ২০০৭, ৩৬৫ স্টেপস টু সেল্ফ কনফিডেন্স।

সারওয়ারি, যোহরা, ২০০৯, পাওয়ারফুল টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস ফর মুসলিমস, ইমান পাবলিশিং।

ট্রেসি, ব্রায়ান, ২০০৭, ইট দ্যাট ফ্রগ! (স্যান ফ্রান্সিসকো: বেরেট-কোহলার পাবলিশারস)।